তাহ্‌রীর ম্যাগাজিন

রমযান-শাওয়াল ১৪৩৫ | জুলাই-আগষ্ট ২০১৪ মূল্য : ২০ টাকা

হে মুসলিম সেনাবাহিনী, বিশেষতঃ ফিলিস্তিন পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রসমূহের সেনাবাহিনী!

ইহুদীদের সীমালঙ্ঘনকারী নির্দয়-পাশবিক কর্মকান্ড দেখার পরও কী আপনাদের ধমনীর রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠে না? তাহলে আর দেরি না করে ফিলিস্তিনের জনগণকে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদান করুন

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সাহায্য ও সমর্থনে হিযবুত তাহ্‌রীর পবিত্র রমযান মাসব্যাপী গণসংযোগ কর্মসূচীর আয়োজন করে

হে মুসলিমগণ! হাসিনা-খালেদার শাসনের অধীনে মৃত্যুবরণ হচ্ছে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ এবং এই কুফর শাসনব্যবস্থাকে অপসারণ করা ফরয দায়িত্ব

প্রসঙ্গ: খিলাফত প্রতিষ্ঠার নামে আইএসআইএস (ISIS) প্রকৃতপক্ষে কি ঘোষণা করল?

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর ওয়েব সাইট: www.ht-bangladesh.info
ফেসবুক লিংক: www.facebook.com/PeoplesDemandBD2
হিযবুত তাহ্‌রীর-এর আমীর শেখ আতা' ইবনে খলিল আবু আর্-রাশতা-এর ফেসবুক লিংক: www.facebook.com/ata.abualrashtah
হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর ইমেল: contact@ht-bangladesh.info
হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য:
০১৭৯৮ ৩৬৭ ৬৪০ htmedia.bd htmedia.bd@outlook.com

সূচীপত্র :

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

হে মুসলিমগণ! হাসিনা-খালেদার শাসনের অধীনে মৃত্যুবরণ হচ্ছে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ এবং এই কুফর শাসনব্যবস্থাকে অপসারণ করা ফরয দায়িত্ব

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজীবনের যাবতীয় বিষয়ের সমাধান হিসেবে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ এবং সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) হুকুম দিয়েছেন শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম বাস্তবায়ন করতে হবে এবং শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে একমাত্র ইসলামকে গ্রহণ করতে হবে...

পৃষ্ঠা : ০২

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সাহায্য ও সমর্থনে হিযবুত তাহ্‌রীর পবিত্র রমযান মাসব্যাপী গণসংযোগ কর্মসূচীর আয়োজন করে

পবিত্র এই রমযান মাসে হিযবুত তাহ্‌রীর-এর নেতা-কর্মী-সমর্থকরা খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার গভীর তাৎপর্য এবং ফিলিস্তিনের মুসলিমদের মুক্ত করার একমাত্র পথ হল খিলাফত, এই দুই বিষয়ে গণসংযোগ কর্মসূচীতে তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করেন...

পৃষ্ঠা : ০৪

লিফলেট : হিযবুত তাহ্‌রীর

হে মুসলিম সেনাবাহিনী, বিশেষতঃ ফিলিস্তিন পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রসমূহের সেনাবাহিনী!

ইহুদীদের সীমালঙ্ঘনকারী নির্দয়-পাশবিক কর্মকান্ড দেখার পরও কী আপনাদের ধমনীর রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠে না? তাহলে আর দেরি না করে ফিলিস্তিনের জনগণকে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদান করুন

পৃষ্ঠা : ০৬

খিলাফত প্রতিষ্ঠার নামে আইএসআইএস (ISIS) প্রকৃতপক্ষে কি ঘোষণা করল

কোন দলকে একটি স্থানে খিলাফত রাষ্ট্রের ঘোষণা দিতে হলে অবশ্যই সেই স্থানে রাসূল (সাঃ)-এর অনুসৃত পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে হবে, এবং উক্ত স্থানে তাদের নিশ্চিত দৃশ্যমান শাসন-কর্তৃত্ব বজায় থাকতে হবে, যাতে তারা উক্ত স্থানের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন, এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষিত স্থানটিতে অবশ্যই একটি রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের অপরিহার্য উপাদানসমূহ বিদ্যমান থাকতে হবে...

পৃষ্ঠা : ১০

অন্যান্য:

- হিযবুত তাহ্‌রীর আয়োজিত পবিত্র রমযান মাসব্যাপী "গণসংযোগ স্টল" -এর চিত্র — পৃষ্ঠা : ০৪
- লিফলেট : আমেরিকা ইরাককে খন্ড-বিখন্ড করছে, এবং অন্যান্য কাফির সাম্রাজ্যবাদীরা তার পেছনে ছায়ার মতো অগ্রসর হচ্ছে — পৃষ্ঠা : ০৮
- ধারাবাহিক নির্বাচিত নিবন্ধ: খিলাফত রাষ্ট্রের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ — পৃষ্ঠা : ১২
- প্রশ্নোত্তর: কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ — পৃষ্ঠা : ১৮
- প্রশ্নোত্তর : চীনকে মোকাবিলার জন্য ভারতের নীতিতে আমেরিকার প্রভাব — পৃষ্ঠা : ২১
- লিফলেট : হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ কুয়েত — পৃষ্ঠা : ২৫
- মন্তব্য : সমুদ্রের কৌশলগত অঞ্চল ভারতের কাছে বিক্রি করে বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সরকারের বিজয়ের ছিটগ্রস্থ দাবি! — পৃষ্ঠা : ২৬
- অনুবাদ : ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা — পৃষ্ঠা : ২৮

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

হে মুসলিমগণ! হাসিনা-খালেদার শাসনের অধীনে মৃত্যুবরণ হচ্ছে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ এবং এই কুফর শাসনব্যবস্থাকে অপসারণ করা ফরয দায়িত্ব

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজীবনের যাবতীয় বিষয়ের সমাধান হিসেবে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ এবং সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) হুকুম দিয়েছেন শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম বাস্তবায়ন করতে হবে এবং শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে একমাত্র ইসলামকে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

"নিশ্চয় আমি আপনার নিকট সত্য কিতাব (আল-কুর'আন) নাযিল করেছি যাতে আপনি মানুষের মধ্যকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন, যা আল্লাহ্ আপনাকে হৃদয়াঙ্গম করান।" [সূরা আন-নিসা : ১০৫]

এবং জনগণ যাতে তাদের খেয়াল-খুশি মতো যেকোন শাসন কাঠামোয় ইসলাম বাস্তবায়ন না করে এজন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একটি সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র শাসন কাঠামো নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"বনী ইসরাইলকে শাসন করতেন নবীগণ, যখন এক নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন তাঁর স্থলে অন্য নবী আসতেন, কিন্তু আমার পর আর কোন নবী নেই। শীঘ্রই অনেক সংখ্যক খলীফা আসবেন।" তাঁরা (রা.) (সাহাবীরা) জিজ্ঞেস করলেন: 'তখন আপনি আমাদের কি করতে আদেশ দেন?' তিনি (সাঃ) বললেন: **"তোমরা (তাদের) একজনের পর একজনের বাই'আত পূর্ণ করবে, তাদের হক আদায় করবে। অবশ্যই আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাদেরকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন।"**

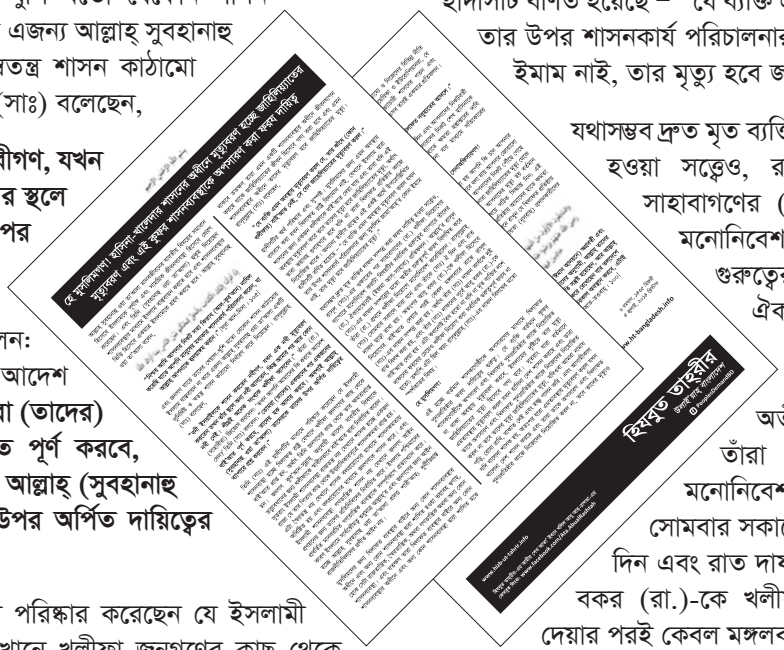

তিনি (সাঃ) এই হাদীসটির মাধ্যমে পরিষ্কার করেছেন যে ইসলামী শাসনব্যবস্থা হচ্ছে খিলাফত রাষ্ট্র যেখানে খলীফা জনগণের কাছ থেকে বাই'আত প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি জনগণের কাছ থেকে তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। জনগণ কুর'আন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী তাদের যাবতীয় বিষয়কে তত্ত্বাবধানের জন্য খলীফাকে স্বাধীনভাবে বাই'আত দ্বারা নির্বাচিত করেন। সুতরাং ইসলামী শাসনব্যবস্থা রাজতন্ত্র নয় যেখানে শাসক হচ্ছে একজন রাজা যে তার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এটা স্বৈরতন্ত্র নয় যেখানে শাসক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে জনগণকে শাসন করে। এবং ইসলামী শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক শাসন নয় যেখানে জনগণ আইন প্রণয়নের জন্য তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে। ইসলাম পশ্চিমাদের প্রবর্তিত মানবরচিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ ইসলামে সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ্'র এবং জনগণের জন্য আইন হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত শারী'আহ্; দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের প্রণীত আইন নয়।

মুসলিমদের জন্য খিলাফত ব্যবস্থার বাইরে অন্য কোন শাসনব্যবস্থার অধীনে এবং অন্য কোন শাসনব্যবস্থা দ্বারা শাসিত হওয়া ভয়াবহ গুণাহ্, হোক সেটা রাজতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক, অথবা গণতান্ত্রিক অথবা অন্য কোন শাসনব্যবস্থা। এবং যতক্ষণ তারা খিলাফত ব্যবস্থার বাইরে অন্য কোন শাসনব্যবস্থার অধীনে এবং অন্য কোন শাসনব্যবস্থা দ্বারা শাসিত হতে থাকবে ততক্ষণ তারা এমন একটি শাসনব্যবস্থার অধীনে জীবনযাপন করছে যাকে জাহিলিয়্যাতের জীবন হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এমন শাসনব্যবস্থার অধীনে তাদের মৃত্যুবরণ হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার কাঁধে (কোন খলীফার) বাই'আত নেই, সে যেন জাহেলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল।"

হাদীসটির অর্থ পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট। মুসলিমদের জন্য এমন অবস্থায় বসবাস করা যখন খিলাফত রাষ্ট্র বিদ্যমান নাই, যেখানে ইসলাম দ্বারা শাসনের জন্য একজন খলীফাকে বাই'আত দেয়া যায় এবং তারা যদি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে তাদের মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু, অর্থাৎ তারা ভয়াবহ গুণাহ্গার হবে যদি না তারা খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকে। অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও এই একই অর্থে উপরোল্লিখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে – "যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যখন তার উপর শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মুসলিম জামা'আহ্'র কোন ইমাম নাই, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু।"

যথাসম্ভব দ্রুত মৃত ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন করা ফরয দায়িত্ব হওয়া সত্ত্বেও, রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর সাহাবাগণের (রা.) খলীফা নিয়োগের ব্যাপারে মনোনিবেশ করাটা বিষয়টির সর্বাধিক গুরুত্বের ব্যাপারে তাঁদের (রা.) ঐক্যমত্যেরই (ইজমা আস্-সাহাবা) প্রতিফলন। আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ)-এর দাফন সম্পন্নের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিলম্বিত করে তাঁরা (রা.) প্রথমে খলীফা নিয়োগে মনোনিবেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সোমবার সকালে মারা যান এবং তাঁকে (সাঃ) ঐ দিন এবং রাত দাফন ছাড়া রাখা হয়। অতঃপর আবু বকর (রা.)-কে খলীফা হিসেবে নিয়োগের বাই'আত দেয়ার পরই কেবল মঙ্গলবারে রাতে রাসূল (সাঃ)-এর দাফন সম্পন্ন করা হয়। অর্থাৎ তাঁর (সাঃ) দাফন কার্যকে দুই রাত বিলম্ব করা হয়, এবং তাঁর (সাঃ) দাফনের পূর্বে আবু বকর (রা.)-কে বাই'আত দেয়া হয়। এটা কখনোই বৈধ হতো না যদি না মৃত ব্যক্তির লাশ দাফনের ফরযের চেয়েও খলীফা নিয়োগ করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয না হতো; তথাপি এটা ছিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাফন বিলম্বের মতো স্পর্শকাতর বিষয়।

হে মুসলিমগণ!

এই হচ্ছে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণের মাধ্যমে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফরয দায়িত্বের গুরুত্ব। যে ব্যক্তি বর্তমান কুফর শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত না থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, ইসলামের দৃষ্টিতে তার মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং যারা বর্তমানে এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যখন হাসিনা দেশ শাসন করছে এবং তারা তাকে অপসারণ এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করল না তবে তাদের মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু, যদিওবা আমরা নামায পড়ি, রোযা রাখি, যাকাত দেই এবং হজ্জ পালন করি। এবং আগামীকাল যদি খালেদা শাসক হয়, অতঃপর যারা এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যখন খালেদা দেশ শাসন করছে এবং তারা তাকে অপসারণ এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করল না, তবে তাদের মৃত্যুও জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু, যদিওবা আমরা নামায পড়ি, রোযা রাখি, যাকাত দেই এবং হজ্জ পালন করি।

আপনাদের চারপাশে তাকিয়ে দেখুন, হে মুসলিমগণ। হাসিনা-খালেদার শাসনের অধীনে কী শুধু জাহিলিয়্যাতের বিস্তৃতিই ঘটছে না? সীমাহীন প্রচণ্ড দুর্নীতি এবং জনগণের সম্পদ লুটপাট করা এখন সরকার এবং রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ! গুম-হত্যা দৈনন্দিন রুটিন কাজ। সেকেন্ডের মধ্যে মানুষকে কুপিয়ে এবং পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে, দ্বিতীয়বার চিন্তাও করতে হচ্ছে না। বিভিন্ন জরুরি প্রয়োজন (যেমন: বিদ্যুত) মেটাতে কর্মকর্তাদের ঘুষ দিতে হচ্ছে এবং অধিকার পেতে বিচারককে ঘুষ প্রদান করা আদালতের আইনে পরিণত হয়েছে। দরিদ্র, হতদরিদ্র এবং এতিমরা মক্কার কুরাইশ সর্দারদের মত বর্তমান শাসকদের দ্বারা উপেক্ষিত হচ্ছে। ঘরে এবং কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সাথে অসদ্ব্যবহার, ব্যাংকে সুদ, বাজারে প্রতারণা, রাস্তায়-পার্কে-লেকে অশ্লীলতা, ঘরে-বাইরে-সমুদ্রতীরে হলিউড-বলিউড ধাঁচের কনসার্ট...। ইসলাম, কুর'আন এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (সাঃ) এর উপর ক্রমাগত আক্রমণ। এই তালিকা সীমাহীন। এবং এসব কর্মকান্ডে শাসকগোষ্ঠী হয় সরাসরি জড়িত অথবা তাদের দ্বারা অনুমোদিত অথবা তাদের কুফর নীতিগুলোর প্রতিফলন।

"হে মুসলিমগণ! জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু হতে নিজেকে রক্ষা করুন। আপনাদের বর্তমান জীবন হচ্ছে কষ্ট, দুর্দশা এবং দুর্ভোগের জীবন। পরকালের জীবনে প্রশান্তি প্রাপ্তির আশায় সচেষ্ট হন। ডান হাতে আমলনামা নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে আপনার রবের সাথে সাক্ষাতের আশায় সচেষ্ট হন। এই শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন..."

হে মুসলিমগণ!

জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু হতে নিজেকে রক্ষা করুন। আপনাদের বর্তমান জীবন হচ্ছে কষ্ট, দুর্দশা এবং দুর্ভোগের জীবন। পরকালের জীবনে প্রশান্তি প্রাপ্তির আশায় সচেষ্ট হন। ডান হাতে আমলনামা নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে আপনার রবের সাথে সাক্ষাতের আশায় সচেষ্ট হন। এই শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, যা আপনাদের জন্য আখিরাতে কল্যাণ বয়ে আনবে এবং দুনিয়ার জীবনে যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে।

ভাববেন না যে পরিবর্তন অসম্ভব এবং আপনারা যা কিছুই করেন না কেন হাসিনা অথবা খালেদা জিয়া অথবা তাদের বংশধরেরাই দেশ শাসন করবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিয়ম ঠিক তার উল্টো এবং তাঁর নিয়মের কোন পরিবর্তন হয় না। এবং তাঁর নিয়ম হচ্ছে জনগণ তার অবস্থার পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং তখন তাঁর সাহায্য সহকারে জনগণ কর্তৃক পরিবর্তন অর্জিত হবে।

إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" [সূরা আর-রা'দ : ১১]

পরিবর্তন অনেক দূরের পথ তা ভেবে পরিবর্তনের কাজ হতে বিরত থাকবেন না। মনে রাখবেন খিলাফত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। আপনাদের চোখের সামনে আপনারা প্রত্যক্ষ করছেন বিশ্বজুড়ে কিভাবে অত্যাচারী যালিম শাসকদের সিংহাসনগুলো কেঁপে উঠছে এবং এসব যালিম শাসকদের সাহায্যে ও নিজেদের বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নে তাদের প্রভুরা, বিশেষতঃ আমেরিকা ও ইউরোপিয়ানরা, যে কত দুর্বল তাও সুস্পষ্ট। বর্তমান অত্যাচারী শাসনের পতন এবং খিলাফতের প্রত্যাবর্তন যে কত সন্নিকটে এসব তারই একমাত্র প্রতিফলন। রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"এবং তারপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত নবুয়্যতের আদলে।"

সুতরাং **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে যোগ দিন এবং আপনাদের নিকটবর্তী এবং ঘনিষ্ঠ পরিচিত নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারদের নিকট শেখ হাসিনাকে অপসারণ এবং **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। এটাই একমাত্র সূক্ষ্ম পরিকল্পনা যার মাধ্যমে সত্যিকারের পরিবর্তন নিশ্চিত।

হে ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ, নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারগণ!

আপনাদের যে কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কি চান আপনার মৃত্যু হোক জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু, নিশ্চিতভাবে বলা যায় আপনার জোরালো উত্তর হবে "না"। এখন সুস্পষ্ট এই বার্তা আপনাদের নিকট পৌঁছে গেছে এবং আপনারা জানতে পেরেছেন যে আপনারা জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন না যদি আপনাদের মৃত্যু হয় বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর অধীনে। সুতরাং এই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিন; এই শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আমাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে কার্যকর পদক্ষেপ নিন। এবং জেনে রাখুন যে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আনসারের ভূমিকা পালনকারী এবং সহায়তা (নুসরাহ্) প্রদানকারীদের জন্য অপেক্ষা করছে এক মহান পুরস্কার।

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আর যেসব মুহাজির এবং আনসারগণ (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর আল্লাহ্ তাদের জন্য এমন জান্নাতসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান, যার মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ সফলতা।" [সূরা আত-তওবাহ্ : ১০০]

৬ রমযান, ১৪৩৫ হিজরী
৪ জুলাই, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সাহায্য ও সমর্থনে হিযবুত তাহ্‌রীর পবিত্র রমযান মাসব্যাপী গণসংযোগ কর্মসূচীর আয়োজন করে

পবিত্র এই রমযান মাসে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতা-কর্মী-সমর্থকরা খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার গভীর তাৎপর্য এবং ফিলিস্তিনের মুসলিমদের মুক্ত করার একমাত্র পথ হল খিলাফত, এই দুই বিষয়ে গণসংযোগ কর্মসূচীতে তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করেন। তারা রমযান মাসের প্রথম শুক্রবার (৬ রমযান/৪জুলাই), **"হাসিনা-খালেদার শাসনের অধীনে মৃত্যুবরণ হচ্ছে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ এবং এই কুফর শাসনব্যবস্থাকে অপসারণ করা ফরয দায়িত্ব"**-শিরোনামে, **হিযবুত তাহ্‌রীর**, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত লিফলেট জনগণের মাঝে ব্যাপক হারে বিতরণের মাধ্যমে তাদের কর্মসূচী আরম্ভ করেন। ঐ দিন তারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী এবং কুমিল্লায় হাজার হাজার লিফলেট বিতরণ করেন এবং পরবর্তী ৩-৪ দিন সেটা অব্যাহত রাখেন; এবং এই ৪-৫ দিনের মধ্যে তারা মোট ১,৫০,০০০ এর বেশী লিফলেট বিতরণ করেন।

হিযব্-এর শাবাবগণ (নেতা-কর্মীগণ) প্রচন্ড আত্মোৎসর্গের সাথে বিভিন্ন মসজিদ প্রাঙ্গন, ব্যস্ত সড়ক, মার্কেটের প্রবেশমুখ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোকাররম ভবন ও অপরাজেয় বাংলা সহ বিভিন্ন জনসমাগমের স্থানে অসংখ্য "গণসংযোগ স্টল" স্থাপন করার মাধ্যমে কর্মসূচীর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। তারা উম্মাহ্'র সাথে মিশে গিয়ে কর্মসূচীর বিষয়বস্তু নিয়ে বেশ ফলপ্রসু মতবিনিময় করেন। এসব গণসংযোগে শাবাবদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং উম্মাহ্'র পক্ষ হতেও **হিযব্**-এর আহ্বানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পরিলক্ষিত হয়। গত দুই সপ্তাহজুড়ে এরকম অসংখ্য "গণসংযোগ স্টল"-এর আয়োজন করা হয়। এবং এর পাশাপাশি সপ্তাহ দুটি জুড়ে দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা বাদ জোহ্‌র এবং আসর বেশীরভাগ দিনগুলোতে ডজন-ডজন মসজিদ প্রাঙ্গনে বক্তৃতার আয়োজন করেন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট আমাদের দো'আ যেন তিনি দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের পুরস্কৃত করেন এবং তাদের, মুসলিমদের এবং আমাদেরকে অতিসত্বর খিলাফতের প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ দান করেন।

বৃহস্পতিবার, ২৬ রমযান, ১৪৩৫ হিজরী
২৪ জুলাই, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

হিযবুত তাহ্‌রীর আয়োজিত পবিত্র রমযান মাসব্যাপী "গণসংযোগ স্টল"-এর চিত্র

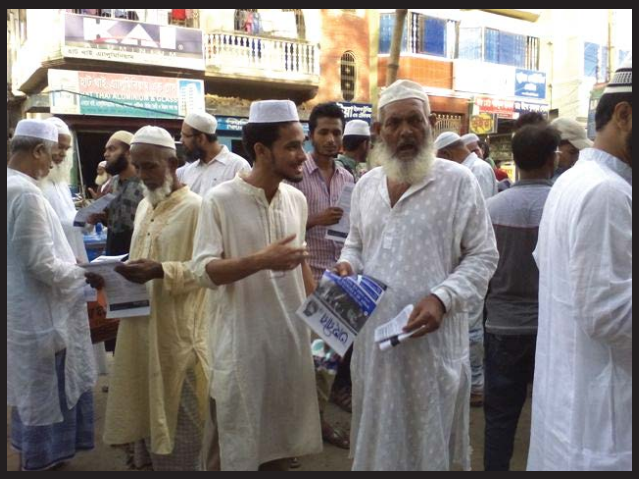

কর্মসূচীর চিত্র: হিযব্-এর শাবাবগণ (নেতা-কর্মীগণ) প্রচন্ড আত্মোৎসর্গের সাথে বিভিন্ন মসজিদ প্রাঙ্গন, ব্যস্ত সড়ক, মার্কেটের প্রবেশমুখ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোকার্‌রম ভবন ও অপরাজেয় বাংলা সহ বিভিন্ন জনসমাগমের স্থানে অসংখ্য "গণসংযোগ স্টল" স্থাপন করেন

লিফলেট : হিযবুত তাহ্‌রীর

হে মুসলিম সেনাবাহিনী, বিশেষতঃ ফিলিস্তিন পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রসমূহের সেনাবাহিনী!

ইহুদীদের সীমালঙ্ঘনকারী নির্দয়-পাশবিক কর্মকান্ড দেখার পরও কী আপনাদের ধমনীর রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠে না? তাহলে আর দেরি না করে ফিলিস্তিনের জনগণকে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদান করুন

(আরবী থেকে অনুবাদকৃত)

টানা ৬দিন ধরে দখলদার ইহুদী বাহিনী গাজার নিরস্ত্র সাধারণ জনগণের উপর সকল প্রকার ভয়ংকর যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা নির্মমভাবে আক্রমণ করে আসছে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাতে মানুষ-গাছপালা-পাথরসমূহ আক্রান্ত হয়... তারা মানুষের মাথার উপর নিজ বাড়িকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে; আর যারা ধ্বংসস্তুপের নীচে জীবিত বেঁচে গেছে তাদেরকে মিসাইল হানা দিচ্ছে... মসজিদসমূহ এবং এমনকি পঙ্গু-বিকলাঙ্গদের আশ্রমগুলোও তাদের এসব দুষ্কর্ম হতে রেহাই পায়নি। তাদের এসব ক্রমবর্ধমান সীমালঙ্ঘনকারী নির্দয়-পাশবিক কর্মকান্ড দেখার পরও পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রসমূহ শুধুমাত্র নিহত এবং আহতের সংখ্যাই গণনা করছে, এবং খুববেশী হলে আহতদের জন্য সীমান্ত খুলে দিয়েছে। এমন যেন তারা বলছে, যদি গাজার অবরোধ হতে মুক্তি চাও তাহলে তাড়াতাড়ি ভয়ংকরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আহত হও... অর্থ্যাৎ, আহত এবং রক্তাক্তরা স্বাগতম! এসব শাসকেরা মাঝেমধ্যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে; এবং কোন সন্দেহ নেই তারা ভালোভাবেই অবগত যে – মৃত্যুমুখে পতিত যেকোন ব্যক্তি চায় যেন কেউ তাকে শেষবারের মত এক বেলা খাবার প্রদান করুক! তাছাড়া এসব শাসকেরা এমন তোষামোদিমুলক মধ্যস্থতা করছে যেন তাদেরকে নিরপেক্ষ মনে হয়! সুতরাং তারা এটা-সেটা বলে অনুনয়-বিনয় করছে, এমনকি নতজানু হয়ে এটা-সেটা বলছে। তারা যখন এসব তুষ্টিমূলক মধ্যস্থতা করেছে ততক্ষণে ইহুদী রাষ্ট্র কর্তৃক ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি গাজাবাসীর রক্তে সিক্ত হয়ে গেছে। এবং তারপর একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি, যা ছিল ইহুদী রাষ্ট্রের নিকট একটি সাময়িক বিশ্রামের মত, এবং তারপর তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আরেক দফা নৃশংস আক্রমণ করেছে এবং এভাবেই চলমান আছে! এ সকল অনুনয়-বিনয় দ্বারা পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রসমূহ এবং তার বাইরের রাষ্ট্রসমূহের শাসকেরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদের সামনে লজ্জিত হওয়াকে তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র পশ্চিমাদের এবং ইহুদীদের সন্তুষ্টির জন্য নিরপেক্ষ অবস্থানের উপর জোর দিচ্ছে!

এসব শাসকদের এমন কাপুরুষোচিত এবং ছল-চাতুরীর আচরণ দেখে মোটেও বিস্ময় কিংবা আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ নাই। কারণ উম্মাহ্ তাদের দ্বারা জর্জরিত হওয়ার আরম্ভের পর থেকে আজ পর্যন্ত এটাই তাদের অভ্যাস এবং চর্চা। কিন্তু সামরিক ক্ষমতার অধিকারী, এবং দ্বীন এবং উম্মাহ্'কে রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত মুসলিম সেনাবাহিনীর আচরণ হচ্ছে বিস্ময়

এবং আশ্চর্যের বিষয়; তাদের ভাই-বোনদের উপর নৃসংশভাবে বোমা বর্ষণের দৃশ্য, চারিদিকে রক্তের চিহ্ন, সাহায্যের জন্য আর্তচিৎকার, এবং তারপর কারও কাছ থেকে কোনরকম সাড়া না পাওয়ার দৃশ্য দেখা এবং শোনার পর কিভাবে তারা তা সহ্য করছে?! সর্বোপরী, যদি শাসকেরা সাড়া না দেয় এবং সেনারা ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের পিতা-মাতা, ভাই এবং সন্তানেরা কোথায়?! সুতরাং কেন আপনারা তাদেরকে আল্লাহ্'র রাহে, আল্লাহ্'র বান্দার সমর্থনে এবং পবিত্র ভূমিকে মুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছেন না? আল্লাহ্'র অনুগ্রহ ও কৃপায় আপনারা আপনাদের সন্তানের জিহাদের জন্য পুরষ্কৃত হবেন, আর ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ... সুতরাং তাদের তাক্বওয়া এবং সক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলুন, যাতে তারা ইহুদীদের দ্বারা আক্রান্ত মুসলিমদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। **"এবং যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের অবশ্যই কর্তব্য।"** [সূরা আল-আনফাল : ৭২] এবং অবমাননা কিংবা অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তারা নীরব থাকতে পারেন না। তাদের উচিত আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী শাসকদেরকে প্রত্যাখ্যান করা, এবং তাদের গুনাহে'র আনুগত্যকারী না হওয়া, এবং এর মাধ্যমেই আপনারা তাদেরকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা এবং আখিরাতের ভয়াবহ আযাব হতে রক্ষা করতে পারেন।

হে মুসলিম সেনাবাহিনী, বিশেষতঃ পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রসমূহের সেনাবাহিনী!

আপনাদের মধ্যে কী এমন একজন বিবেকবান পুরুষ নাই যিনি গাজার জন্য বিজয় বয়ে আনতে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান তার সৈনিক ভাইদের জন্য এমন একটি কার্যকরী নেতৃত্বের সূত্রপাত ঘটাতে পারেন, যাতে তার নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করা থাকে এবং তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে উচ্চ মর্যাদায় আসীন হবেন? আপনাদের মধ্যে কী এমন একজন নাই যিনি পারেন ইসলামের ইতিহাসের মহান সেইসব মুসলিম সেনা নেতৃত্বের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে পুনরুদ্ধার করতে যারা কোন এক নারীর অসহায় আকুতিতে সাঁড়া দিয়ে সিংহের ন্যায়, 'হে আল্লাহ্'র সৈনিক অশ্বারোহীগণ...' হুংকার দিয়ে ছুটে এসেছিল?

এটা বাস্তব এবং দৃশ্যমান যে আপনাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখতে শাসকগণ ব্যাপক শ্রম দিচ্ছে, এবং তারা রক্ষার বদলে আপনাদের ভাই-বোনদের হত্যা করতে চায়... কিন্তু এসব শাসকদের কে রক্ষা করছে – আপনারা নন কি? তাই এসব শাসকদের পরিণতি আপনাদের হাতের মুঠোয়। সুতরাং যদি আপনারা তাদের বিপরীতে অবস্থান নেন, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং আপনাদের ভাই-বোনদের সাহায্য করেন তাহলে আপনারাই জয়ী হবেন, এবং যদি আপনারা তাদের অমান্য করেন তবে আপনারা সফল হবেন, কারণ **"সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র আনুগত্যের বাইরে গিয়ে সৃষ্টিজগতের কোন আনুগত্য নাই।"** [আহ্‌মাদ এবং তাবারানি হতে বর্ণিত]

সুতরাং, আপনাদের মধ্যে একজনও কী বিবেকবান মানুষ নাই যিনি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে বিজয় উপহার দিতে পারেন? আপনাদের মধ্যে কী মু'সাব বিন উমায়ের, আসাদ বিন যুরা'রাহ্ , উসাইদ বিন হুদায়ের এবং সা'দ

বিন মু'য়ায নাই যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে সাহায্য করেছিলেন, এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয়েছিলেন, যার ফলে আল্লাহ্'র দ্বীনকে সামরিক সহায়তা প্রদানকারী, বিজয় আনয়নকারী সা'দ বিন মু'য়ায (রা.)-এর মৃত্যুতে আল্লাহ্ আর-রহমানের আরশ কেঁপে উঠেছিল? আল-বুখারী, যাবির (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, **"সা'দ ইবনে মু'য়াযের মৃত্যুতে আল্লাহ্'র আরশ কেঁপে উঠেছিল।"** আপনাদের মধ্যে কী এমন একজন বিবেকবান পুরুষ নাই যিনি পূর্বপুরুষদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পরম্পরা পুনরুদ্ধার করতে পারেন; খিলাফত প্রতিষ্ঠা এবং একজন খলিফা নিয়োগ করতে পারেন? যিনি আপনাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাঁধা না দিয়ে বরং নেতৃত্ব দিবেন, কারণ ইমাম হচ্ছে সেই ঢাল যার পেছনে জনগণ যুদ্ধ করে। আবু হুরায়রা (রা.) হতে মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে রাসূল (সাঃ) বলেছেন: **"নিশ্চয়ই ইমাম হচ্ছে সেই ঢাল যার পেছনে থেকে জনগণ যুদ্ধ করে এবং নিজেদেরকে আত্মরক্ষা করে।"** এবং তারপর, তার নেতৃত্বেই ইহুদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব এবং এই পবিত্র ভূমিকে ইসলামী শাসনের নেতৃত্বের অধীন ভূমিতে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব... এবং একমাত্র খলিফাই পারবেন জেরুজালেম এবং তার চারপাশের পবিত্র ভূমি জয়কারী উমর আল-ফারুক, জেরুজালেমকে ক্রুসেডারদের হাত হতে মুক্তকারী সালাহ্উদ্দীন এবং জেরুজালেমের সুরক্ষাকারী ও একে জীবন এবং সমস্ত অর্জনের চেয়েও মূল্যবান হিসেবে বিবেচনাকারী সুলতান আব্দুল হামিদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পুনরুদ্ধার করতে...

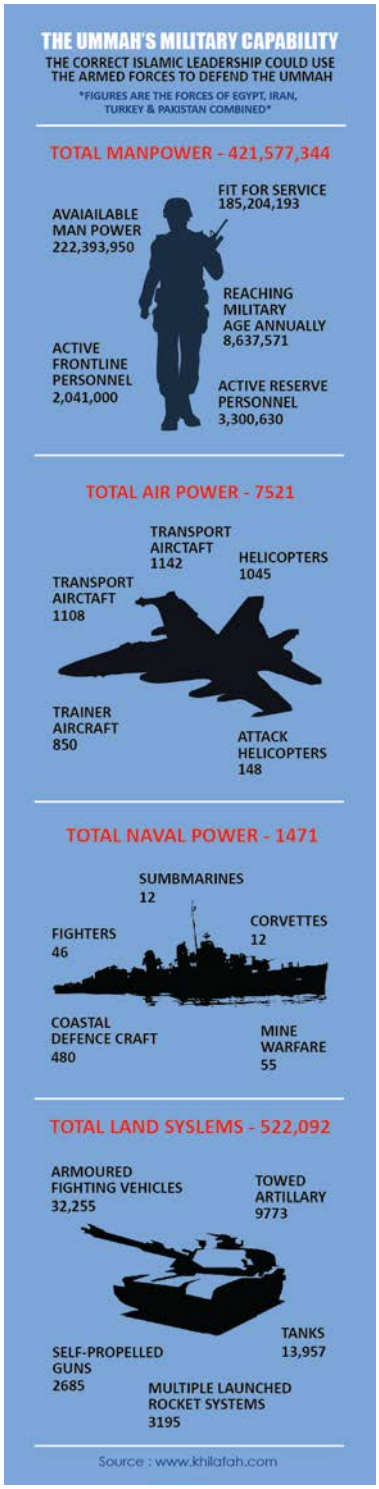

এটা আমাদের সবার বোধগম্য যে, আসমান হতে ফেরেশতারা নেমে এসে খিলাফত প্রতিষ্ঠা এবং সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে ইহুদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করবেন না। কিন্তু যদি আমরা ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে আন্তরিকতা, সততা এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করি তবে আল্লাহ্ ফেরেশতা পাঠিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করবেন। সুতরাং সেনাবাহিনী যদি ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে অগ্রগামী হয়, এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র দ্বীনের সাহায্যকারী হয়, তখনই কেবল পরাক্রমশালী আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যে ফেরেশতা পাঠাবেন, আমাদের বদলে যুদ্ধ করতে নয়; এবং পবিত্র কুর'আনে অত্যন্ত যথাযথ জ্ঞানময় ভাষায় এই বিষয়ে আয়াত বিদ্যমান: **"বরং যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর ও সংযমী হও এবং তারা যদি তোমাদের উপর নিপতিত হয়, তবে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ সহস্র বিশিষ্ট ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।"** [সূরা আলি-ইমরান : ১২৫] যদি আমরা ধৈর্য্যধারণ করি এবং ত্বাকওয়া অবলম্বন করি, এবং যুদ্ধ দ্বারা শত্রুর মোকাবেলা করি তাহলে আল্লাহ্ হাজার হাজার ফেরেশতা দিয়ে আমাদের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন... এটাই গাজা কিংবা আক্রান্ত অন্যান্য মুসলিমদের সাহায্য করার একমাত্র উপায়, এবং সত্যই- **"এমন সাফল্যের জন্যে পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।"** [সূরা আস-সাফ্ফাত : ৬১]

হে মুসলিমগণ, হে মুসলিম সেনাবাহিনী, বিশেষতঃ পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রসমূহের সেনাবাহিনী!

গাজায় ইহুদীদের অপরাধ ক্রমবর্ধমান, এবং গাজাবাসীর সাহায্যে শাসকেরা পুরোপুরি নীরব। তাদের মুখ থেকে এমনকি গতানুগতিক নিন্দা জ্ঞাপনও বের হয়নি, এবং যদি তারা করত তবে তা করত বিব্রত হওয়ার ভয়ে... যদিও গাজার চ্যাম্পিয়ানদের দেশীয় তৈরি অস্ত্র শত্রুদেরকে হতভম্ব, রক্তাক্ত এবং আতংকিত করেছে, কিন্তু ইহুদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হবে না। এবং শত্রুর বিপক্ষে জয়ী হতে, এবং এর অস্তিত্বকে বিলীন এবং শক্তিশালী আক্রমণের দ্বারা চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে সেনাঅভিযান প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদী কাফিররা, ইহুদী রাষ্ট্রের সমর্থক এবং দালালেরা ফিলিস্তিনের বিষয়টিকে ইসলামী বিষয় হতে আরবদের বিষয়, তারপর ফিলিস্তিনের জাতীয় বিষয়, এমনকি তার চেয়েও অর্ধেক একটি বিষয়ে নামিয়ে আনতে সফল হয়েছে! সবার কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে ফিলিস্তিনকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা সম্ভব হবেনা যদি না একে পুনরায় ইসলামী বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। যাতে তা দূরপ্রাচ্যের ইন্দোনেশিয়া হতে দূরপশ্চিমের মরক্কো পর্যন্ত সামরিক অথবা বেসামরিক সকল মুসলিমের জন্য একটি বিষয়ে পরিণত হয়। যাতে মুসলিমরা অনুধাবন করতে পারে যে ফিলিস্তিন তাদের বন্ধু রাষ্ট্র নয়, এমনকি সহদর রাষ্ট্রও নয়, বরং তাদের আত্মা, তাদের ভূ-খন্ড, তাদের সম্মান এবং তাদের ফরয দায়িত্ব... যেহেতু মুসলিমরা একটি শরীরের মত – **"যদি শরীরের যেকোন একটি অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হয় তবে সমস্ত শরীর তার ব্যাথা অনুভব করে।"** [আল-নু'মান বিন বশিরের বরাত দিয়ে মুসলিম শরিফে বর্ণিত]

হে মুসলিম সেনাবাহিনী, বিশেষতঃ পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রসমূহের সেনাবাহিনী!

হিযবুত তাহ্‌রীর, আপনাদেরকে আহ্বান করছে এবং আপনাদের প্রতিজ্ঞাকে জাগ্রত করছে, এবং আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই পবিত্র ভূমি হচ্ছে মুসলিম ভূ-খন্ডের অলংকার, দুই ক্বিবলার প্রথম ক্বিবলা, এবং রাসূল (সাঃ) ইসরা-মিরাজের বিরতি স্থান। সুতরাং শত্রুর মোকাবেলায় এবং আপনার ভাই-বোনদের সাহায্যে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ুন। সর্বশক্তিমান বলেন: **"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং আল্লাহ্'র পথে নিজেদের জান এবং মাল দিয়ে জিহাদ কর, এটিই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।"** [সূরা আত্-তওবা : ৪১]

এবং তাদের মত হবেন না, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, **"হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহ্'র পথে বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি নগণ্য।"** [সূরা আত্-তওবা : ৩৮]

নতুবা: **"তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্যদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।"** [সূরা মুহাম্মদ : ৩৮]

১৪ রমযান ১৪৩৫ হিজরী
১২ জুলাই ২০১৪ খৃষ্টাব্দ

লিফলেট : হিযবুত তাহ্‌রীর

আমেরিকা ইরাককে খন্ড-বিখন্ড করছে, এবং অন্যান্য কাফির সাম্রাজ্যবাদীরা তার পেছনে ছায়ার মতো অগ্রসর হচ্ছে; মুসলিম ভূমিকে খন্ড-বিখন্ড করার ক্ষেত্রে তারা তাদের সমস্ত মতপার্থক্য ভুলে যায়

১০ই জুন, ২০১৪ তারিখে সশস্ত্র বিদ্রোহীরা মসুলে প্রবেশের পর অদ্যবদী ইরাকের ঘটনাপ্রবাহ আপাতদৃষ্টিতে সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে ক্রমশঃ সামনের দিকে এগুচ্ছে। মসুল এবং তারপর তিকরিতে বিনা প্রতিরোধে ইরাকি সেনাবাহিনীর পতন ঘটে, যদিও তা ছিল সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের নির্দেশে, অনেকটা পণ্য আদান-প্রদানের মত। এরপর সেনাবাহিনীকে বাদ দিয়ে নূরি আল মালিকি কর্তৃক আধা সামরিক বাহিনী প্রেরণ, দিয়ালা শহরে আক্রমণ, অতঃপর পশ্চাৎপদসরণ; একই দৃশ্য বাগদাদের নিকটবর্তী অঞ্চলেও। এমনকি সবচেয়ে বড় তেল শোধনাগার বাইজীতে মিসাইল, রকেট এবং বিমান হামলা... এবং সেই সাথে তাল আফার এবং অন্যান্য স্থানে সংঘর্ষ, এত অল্প সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, যেন এসবই ছিল পূর্বপরিকল্পিত। এসব ঘটনাপ্রবাহের সাথে বিভিন্ন বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের দায়মোচনমূলক এবং সাম্প্রদায়িক আহ্বান যুক্ত হয়, গণবিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে, এবং পূর্ণাঙ্গরূপে দৃশ্যমান হয়, কাঁদে এবং কাঁদায়, মেসোপটামিয়ার ভূমিতে, যা একসময় বিশ্বের রাজধানী ছিল যার খলীফা আকাশের মেঘমালার প্রতিও হুকুম প্রদান করতেন!

যদিও ঘটনাপ্রবাহের গুরুত্ব অনুপাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। বিভিন্ন রাজনীতিবিদের নিকট হতে মাপা বক্তব্য এসেছে, যা ঘটনার গুরুত্বের সাথে খাপ খায়নি। কেউ এর জন্য সিরিয়ায় চলমান সহিংসতাকে, অথবা সুন্নীদের অধিকারহরণকে, কেউবা মালিকির স্বৈরাচারি শাসনকে দায়ী করেছে... কিন্তু এসব কিছুই আজকের ঘটনা নয় বরং অনেকদিন আগে থেকেই দৃশ্যমান! তাই আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে বলিষ্ঠ ছিলনা, যদি না এক্ষেত্রে রাজনৈতিক মঞ্চের খেলোয়াড়রা পূর্বে থেকেই কলকাঠি নেড়ে থাকে বা ঘটনাপ্রবাহ তাদের জানা থাকে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল ওবামার বক্তব্য। ১৩ই জুন শুক্রবার ২০১৪, ওবামা বিশ্ববাসীকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে, ইরাক হতে তেল সরবরাহে বাধা পড়লে উপসাগরীয় দেশসমূহের মজুদ হতে সেই ঘাটতি পূরণ করা হবে। তার বক্তব্য হতে বুঝা যায় মার্কিন প্রশাসন নতুন পরিস্থিতিতে অবাক হওয়াতো দূরের কথা বরং তেল সংকট নিরসনে পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করে রেখেছিল। ওবামা আরও বলে যে, "ইরাকিদের তরফ থেকে রাজনৈতিক সমাধানের অনুপস্থিতিতেও ওয়াশিংটন কোন সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না।" এ ঘোষণা এসেছে যদিও আমিরিকা এবং ইরাকের মধ্যে নিরাপত্তা চুক্তি বিদ্যমান, যদিও ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিবারীর তরফ থেকে ১৮ই জুন বুধবার বলা হয়েছে যে, "জঙ্গীদের বিরুদ্ধে বিমান হামলার জন্য বাগদাদ ওয়াশিংটনের কাছে সহায়তা চেয়েছে।" আমেরিকার জয়েন্ট চীফ অফ স্টাফস জেনারেল ড্যাম্পসি, কংগ্রেস সদস্যদের সামনে এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছে। এর অর্থ হচ্ছে, ইরাকে নাক গলানোর ব্যাপারে আমেরিকার এ মুহূর্তে কোন তাড়া নেই, বরং সে পূর্বপরিকল্পিত কিছু বিষয় অর্জন করার জন্য সময়ক্ষেপণ করছে। আর বৃটেনের কথা যদি ধরি, ইরাককে ঘিরে তার স্বার্থ আমেরিকার থেকে ভিন্ন হলেও, এক্ষেত্রে সেও আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, কারণ বিষয়টি একটি মুসলিম দেশকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার বিষয়। ১৬ই জুন, বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে ইরাকে হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারে এক প্রশ্নের জবাবে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী, উইলিয়াম হেগ বলে, "যেকোন সামরিক হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র শক্তি এবং সামর্থ্যের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী।"

কেউ যদি চলমান ঘটনাপ্রবাহ সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে তবে বুঝতে পারবে বর্তমান ঘটনাগুলো আমেরিকা কর্তৃক ইরাক আক্রমণের ধারাবাহিক ফলশ্রুতিই নয়, বরং তারও আগে থেকেই এ ঘটনাগুলোর উৎপত্তি হয়েছে, যখন ১৯৯১ সালে আমেরিকা ইরাকের উত্তরাঞ্চলে নো ফ্লাই জোন ঘোষণা করেছিল এবং কুর্দিস্তান একটি আপাত রাষ্ট্র সাদৃশ্যে পরিণত হয়েছিল। আমেরিকা ২০০৩ সালে যখন ইরাক আক্রমণ করল, তখন সেখানে নিযুক্ত আমেরিকান গভর্ণর ব্রেমার এমন একটি সংবিধান প্রণয়নের নীলনকশা রূপায়িত করেছিল যা মূলতঃ ইরাককে খন্ড-বিখন্ড করে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বীজ বপন করেছিল। বিভক্তির বীজ ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল ২০১১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, যতদিন না আমেরিকার সামরিক বাহিনী প্রস্থান করে, নিজ স্বার্থের নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বজায় রেখে আমেরিকা তার সামরিক বাহিনীকে প্রস্থান করায় ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে, এবং ততদিনে বিভক্তির বীজ ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছিল। এরপর, সরকার প্রধান হিসেবে নিষ্ঠুর, অসহিষ্ণু, স্বৈরাচারী এক শাসককে ক্ষমতায় বসিয়ে বিভক্তির এই পদযাত্রাকে আমেরিকা আরও সুগম করল। মালিকি বেশ ভেবেচিন্তেই ইরাকের উত্তরাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলে নজিরবিহীন নৃশংসতা ও দমন-পীড়ন শুরু করল। যখনই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসত সে উস্কানিমূলক বক্তব্য এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে ঘৃণার আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করে দিত। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প আরও ছড়িয়ে পড়ল, যখন শিয়া বেসামরিক বাহিনীর উৎপত্তি ঘটানো হল, এবং আইএসআইএসের কার্যকলাপকে সুন্নি সন্ত্রাস হিসেবে উপস্থাপন করা হল, যদিও মসুল এবং তিকরিতে যেসব বাহিনী প্রবেশ করেছিল, তার মধ্যে আইএসআইএসের পাশাপাশি অন্যান্য সুন্নি দলের উপস্থিতি পরিলক্ষিত ছিল... এবং ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়নি, প্রতিবেশী দেশগুলোও বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রঙ্গে রাঙায়িত করার প্রয়াস চালাচ্ছে, এসব কিছুই হচ্ছে আমেরিকার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, যার পিছনে বৃটেনও রয়েছে এবং অন্যান্য দালালেরা যারা একটি অখন্ড ইরাক বিরোধী। যারা চায় এমন একটি দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব-সংঘাত সম্বলিত ইরাক, যার অধিবাসীরা একে অপরকে হত্যায় লিপ্ত হবে! এবং প্রত্যেকটা গোষ্ঠী নিজের অঞ্চল আঁকড়ে আছে, যার পরিণতিতে বিভিন্ন প্রাদেশিক

পৃষ্ঠা : ০৮

বিভাজনের দাবী জোরালো হচ্ছে। এ প্রত্যেকটি ঘটনাই এত সুস্পষ্টভাবে ঘটেছে যে কুর্দিস্তান এর বাস্তবতা ভালভাবেই বুঝতে সক্ষম হয়েছে। আর তাই বিদ্রোহীরা যে মুহূর্তে মসুলের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছিল, কুর্দিস্তানের পেশমার্গা বাহিনী দ্রুত কিরকুক এবং তার আশপাশের অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় হয়ে উঠে। বার্জানির চীফ অফ ষ্টাফ ফুয়াদ হুসাইনের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স প্রকাশ করে, "ইরাক এমন একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে যা মসুলের পতনের আগের ইরাক থেকে ভিন্ন, কুর্দরা আলোচনা করবে কিভাবে এই নতুন ইরাকের সাথে মানিয়ে নেয়া যায়।"

হে মুসলিমগণ...! হে আরবের অধিবাসীগণ...! হে কুর্দি জনগণ...! হে সুন্নি জনগণ...! হে শিয়া জনগণ...! হে মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীগণ...!

আপনাদের অনেক রক্ত ঝরেছে, আপনাদের সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে, আপনাদের শুধু ঘরই নয়, বরং মসজিদগুলোও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং ইরাক হয়ে পড়েছে একটি দুর্বল ভঙ্গুর রাষ্ট্রে, যা অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপকারীদেরকে দমাতে অক্ষম। আপনাদের মধ্যে কি এমন কোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নেই যিনি এ ঘটনাসমূহ থামাতে বদ্ধপরিকর? আপনারা কি লক্ষ্য করছেন না যে আমিরিকা ও তার সহযোগীরা এবং তার দালাল ও অনুসারীরা বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধিতে তৎপর, যাতে করে এটি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনটি প্রশাখায় বিস্তার লাভ করতে থাকে, তিনটি ফাটলে বিভক্ত হয়ে যায়, তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যায়? যথা- কুর্দি, সুন্নি এবং শিয়া; যাদের মধ্যে পারস্পরিক কোন শক্তিশালী বন্ধন থাকবে না, সম্পর্কের ভিত্তি হয়ে পড়বে একটি চিকন সুতার মত কিংবা তার চেয়েও দুর্বল! তাই নয় কি? আপনারা কি লক্ষ্য করছেন না যে, আমেরিকা কিভাবে কুর্দিস্তানকে সুরক্ষিত করেছে? কিভাবে ব্রেমার প্রণীত সংবিধানে "মাযহাববাদ" তথা "সাম্প্রদায়িক বিভাজন" সম্বলিত ব্যবস্থার বীজ বপন করা হয়েছে? আপনারা কি এই ভেবে অবাক হন না যে, কিভাবে আমেরিকা বর্তমান সরকারে এমন একজন যালিমকে ক্ষমতায় বসিয়েছে যে নির্লজ্জভাবে শত্রুতার বীজ বপন করেছে? আপনারা কি একটুও অবাক হচ্ছেন না এই দেখে যে, আমেরিকা কিভাবে এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছে এবং এর মাধ্যমে কুর্দিদেরকে আরবদের কাছ থেকে আলাদা করতে চাচ্ছে? সুন্নিদেরকে আলাদা করতে চাচ্ছে শিয়াদের কাছ থেকে? আপনারা কি একটুও অবাক হচ্ছেন না এই দেখে যে, কিভাবে আমেরিকা বৃটেনকে সাথে নিয়ে তার নিযুক্ত দালাল এবং অনুসারীদের সাথে একীভূত হয়ে এ ঘটনাপ্রবাহকে এক চরম ফিতনার দিকে নিয়ে যাচ্ছে; যদিও ইরাককে ঘিরে তার এবং বৃটেনের স্বার্থ ভিন্ন, তথাপিও তারা মুসলিম ভূমিকে ছিন্ন-বিছিন্ন করার ক্ষেত্রে একীভূত?!

> *"এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে, অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবন করে" [সূরা ক্বাফ : ৩৭]*

শত শত বছর ধরে ইসলাম আপনাদেরকে একীভূত করে রেখেছিল। এর ছায়া এক দীর্ঘ সময় ধরে আপনাদেরকে আশ্রয় প্রদান করেছিল। যার কারণে আপনারা ছিলেন সংঘবদ্ধ এবং সম্মানিত। আপনারা একসাথে সুসময় পার করেছিলেন, একসাথে শত্রুকে মোকাবিলা করেছিলেন। আপনাদের এই ভূমি যুদ্ধজয়ের ভূমি, এই ভূমি আল-কাদিসিয়ার বিজয়ের ভূমি, এই ভূমি আল-বুওয়াইব পারস্য ইয়ারমুকের ভূমি, হারুনুর রশীদ এবং আল-মু'তাসিমের ভূমি, সালাহউদ্দিন আইয়্যুবীর ভূমি, অতীতের বিজয়ী এবং আল্লাহ্'র ইচ্ছায় ভবিষ্যতের বিজয়ীদেরও ভূমি। অবিভক্ত ইরাক এর জনগণের কল্যাণে যতটুকু শক্তিশালী, আর বিচ্ছিন্ন ইরাক এর বিভক্তির কারণে ততটুকুই দুর্বল। কুর্দিরা যদি মনে করে একটি স্বাধীন কুর্দিস্তান তাদের জন্য সম্মান বয়ে আনবে, তবে এটি হবে ক্ষণস্থায়ী, যা কিছুক্ষণ পরেই তাদেরকে পতনের দিকে ধাবিত করবে। একইভাবে সুন্নিরা যদি মনে করে উত্তর এবং পশ্চিম ইরাক নিয়ে গঠিত অঞ্চল তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাবে, তবে তা হবে ক্ষণিকের স্ফুরণ যার পরক্ষণেই ধেয়ে আসবে দুর্ভোগ আর কষ্ট। একইভাবে শিয়ারা যদি মনে করে যে দক্ষিণ ইরাক নিয়ে গঠিত অঞ্চল তাদেরকে যেমন খুশি তেমন শাসনের অধিকার দিবে তবে তাও হবে ক্ষণিকের জন্য; এবং পরক্ষণেই তাদের জন্য অপেক্ষা করবে দুর্বলতা এবং অপমান।

হে মুসলিমগণ...! হে আরবের অধিবাসীগণ...! হে কুর্দি জনগণ...! হে সুন্নি জনগণ...! হে শিয়া জনগণ...! হে মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীগণ...!

একজন পথপ্রদর্শক কখনও তার জনগণের সাথে মিথ্যাচার করেনা। **হিযবুত তাহ্‌রীর** আপনাদের জন্য এক সচেতন পথপ্রদর্শক। সুতরাং আমেরিকা এবং ইউরোপের দিকে ঝুঁকবেন না, তারা আপনাদেরকে আঘাত করতে বদ্ধ পরিকর। তারা ইরাককে তিন ভাগে বিভক্ত করতে চায় যাদের মধ্যে শুরুর দিকে নামমাত্র সম্পর্ক বিরাজ থাকলেও, যাতে করে কালক্রমে তাও ধ্বংস করে দেয়া যায়। আমাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা শক্তি এবং আমেরিকার বিষাক্ত চক্রান্ত আমাদের কাছে বোধগম্য। কিন্তু ইরাকের জনগণের তরফ থেকে তা গ্রহণ করা, তার জন্য চেষ্টা করা এবং আমেরিকার কাছে এই ব্যাপারে ধর্ণা দেয়া এক ভয়ংকর অমঙ্গল পরিণতির দিকে ধাবিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকে আগুন পাকড়াও করবে। আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই। অতএব তোমরা কোথাও সাহায্য পাবে না।"** [সূরা হুদ : ১১৩] আপনারা এক উম্মাহ্'র অংশ, যাদেরকে বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করা হয়েছে। **"আর তোমরা সকলে আল্লাহ্'র রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর, এবং কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না।"** [সূরা আলি ইমরান : ১০৩] এই জাতিকে বিবাদে লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে, তা না হলে ঐক্য বিনষ্ট হয়ে পড়বে এবং শত্রুরা সুযোগ পেয়ে যাবে। **"...এবং তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হইওনা, তাতে তোমাদের সাহস কমে যাবে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে..."**। [সূরা আল-আনফাল : ৪৬]

হে মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীগণ! এই বিষয়টি সংশোধন হবে না, যদি না আমরা ভিত্তিমূল থেকে শুরু করি, আল্লাহ্'র নাযিলকৃত বাণী দ্বারা শাসন করি, আল্লাহ্'র পথে জিহাদ করি, আল্লাহ্'র রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করি এবং আল্লাহ্'র শত্রুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি, এবং সাম্প্রদায়িক বিভক্তি এবং মাযহাবের কারণে বিভক্তিকে প্রত্যাখ্যান করি। জাবির হতে বুখারী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, **"পরিত্যাগ কর, এটি দূষিত"**... সাম্প্রদায়িকতা এবং মাযহাবের ভিত্তিতে বিভাজন পরিত্যাগ করুন, এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে যে পরিচয় প্রদান করেছেন তাকে আঁকড়ে ধরুন। **"...আল্লাহ্ তোমাদেরকে মুসলিম পরিচয়ে পরিচিত করেছেন।"** [সূরা আল-হাজ্জ : ৭৮] সুতরাং তাঁর দিকেই ফিরে আসুন এবং তাঁর নির্দেশিত খোলাফায়ে রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠিত করুন, যার মাধ্যমে আপনারা হবেন মহিমান্বিত, যার মাধ্যমে আপনারা আরও একবার মেঘমালাকে নির্দেশ প্রদান করবেন, এবং যার মাধ্যমে আপনারা একই বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্'র নিকট ফিরে যাবেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে, অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবন করে।"** [সূরা ক্বাফ : ৩৭]

২১ শাবান, ১৪৩৫ হিজরী
১৯ জুন, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রসঙ্গ: খিলাফত প্রতিষ্ঠার নামে আইএসআইএস (ISIS) প্রকৃতপক্ষে কি ঘোষণা করল

(অনুবাদকৃত)

আইএসআইএস কর্তৃক খিলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণার প্রকৃত বাস্তবতা অনুসন্ধানে প্রশ্নকারী সকল ভাই-বোনদের প্রতি:

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্‌ ওয়া বারাকা'তুহু,

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

১. কোন দলকে একটি স্থানে খিলাফত রাষ্ট্রের ঘোষণা দিতে হলে অবশ্যই সেই স্থানে রাসূল (সাঃ)-এর অনুসৃত পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে হবে, এবং উক্ত স্থানে তাদের নিশ্চিত দৃশ্যমান শাসন-কর্তৃত্ব বজায় থাকতে হবে, যাতে তারা উক্ত স্থানের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন, এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষিত স্থানটিতে অবশ্যই একটি রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের অপরিহার্য উপাদানসমূহ বিদ্যমান থাকতে হবে...

মদীনা আল-মুনাওওয়ারায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন : শাসন-কর্তৃত্ব ছিল রাসূল (সাঃ)-এর হাতে এবং রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নিরাপত্তা ছিল ইসলামী শাসন-কর্তৃত্বের অধীনে এবং স্থানটিতে (মদীনাতে) একটি প্রকৃত রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের সবগুলো উপাদান বিদ্যমান ছিল।

২. খিলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকারী এই দলটির (আইএসআইএস) সিরিয়া কিংবা ইরাকে না আছে কোন শাসন-কর্তৃত্ব, না আছে সেখানকার আভ্যন্তরীণ কিংবা বাহ্যিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার উপর কোন দখল। তথাপিও তারা এমন একজনকে খলিফার বাই'আত (আনুগত্য) দিয়েছে, যে কিনা নিজেকে খলীফা ঘোষণা করবে দূরের কথা প্রকাশ্যেই আসতে পারে না। বরং তার অবস্থান ঠিক আগের মতই অপরিবর্তিত আছে অর্থাৎ রাষ্ট্র ঘোষণার আগের অবস্থার মতই সে আত্মগোপনে আছে! এবং এটা রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যা করেছেন তার সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। তিনি (সাঃ)-এর উপর শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক, তাঁর জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে 'সাওর' পর্বত গুহায় আশ্রয় নেয়া অনুমোদিত ছিল কিন্তু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তিনি প্রকাশ্যে জনগণের বিষয়াবলীর তত্ত্বাবধান করেছেন, সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, বিচার-ফয়সালা করেছেন এবং বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছেন ও গ্রহণ করেছেন; সুতরাং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বের এবং পরের অবস্থার মধ্যে দৃশ্যমান পার্থক্য রয়েছে...

সুতরাং সংগঠনটি কর্তৃক খিলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা মূল্যহীন কিছু ফাঁকাবুলিসর্বস্ব; বরং তাদের ভিতর লুকায়িত কোনকিছুকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা, যা পূর্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জন কর্তৃক কোন সত্যতা ছাড়া কিংবা অপরিহার্য রাষ্ট্র উপাদান ছাড়া রাষ্ট্র ঘোষণার শামিল। সুতরাং, অপরিহার্য রাষ্ট্র উপাদান, শাসন-কর্তৃত্ব, নিরাপত্তা কিংবা প্রতিরক্ষার কোন তোয়াক্কা না করেই, কখনও তাদের মধ্যকার কেউ নিজেদের খলীফা এবং অন্যরা নিজেদের মাহদী কিংবা আরও অনেক কিছু ঘোষণা দিয়েছে!

৩. খিলাফত একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাষ্ট্র। শারী'আহ্‌ তা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং শাসন, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনায় গৃহিত আহ্‌কামসমূহের ধরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছে। তাই খিলাফত বেতার, টেলিভিশন, পত্রিকা কিংবা ইন্টারনেটে প্রচারিত নামমাত্র কোন ঘোষণা নয়। বরং তা প্রতিষ্ঠার সংবাদ এতটাই অভুতপূর্ব হবে যা সমস্ত দুনিয়াকে প্রকম্পিত করবে, এবং তা বাস্তবতায় শক্ত ভিত্তিমুলের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, এর শাসন ক্ষমতা ঐ ভূখন্ডের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নিরাপত্তা তত্ত্বাবধান করবে, এবং ইসলাম বাস্তবায়ন করবে, এবং দাওয়াহ্‌ ও জিহাদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামকে ছড়িয়ে দিবে।

৪. তাদের এই ঘোষণা মূল্যহীন ফাঁকাবুলিসর্বস্ব ছাড়া আর কিছুই না, যা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র কাঠামোর বাস্তবতার মধ্যে কোন উন্নতি বা অবনতি বয়ে আনবে না। ঘোষণার পূর্বে এটা ছিল সশস্ত্র সংগঠন এবং পরেও তাই আছে। এর পরিস্থিতি অনেকটা অন্যান্য সশস্ত্র সংগঠনের মত যারা সিরিয়া কিংবা ইরাক কিংবা উভয়টিতে কোন শাসন-ক্ষমতা অর্জন করা ছাড়াই নিজেদের মধ্যে এবং সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। আইএসআইএস সহ এই গোষ্ঠীগুলোর যেকেউ যদি রাষ্ট্র উপাদান সম্বলিত একটি উপযুক্ত স্থানের শাসন-কর্তৃত্ব অর্জন করে খিলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে ইসলাম বাস্তবায়ন করত, তখনই কেবল বিষয়টি যাচাই যোগ্য হতো যে তারা কতটুকু শারী'আহ্‌ অনুসরণ করেছে কিংবা তাদের অনুসরণ করা যায় কিনা। কারণ খিলাফত প্রতিষ্ঠা শুধু **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর দায়িত্ব নয় বরং সকল মুসলিমের, সুতরাং যারাই সঠিক পন্থায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করুক না কেন, সেই খিলাফতের আনুগত্য করা হবে...

কিন্তু বাস্তবতা এমন নয়, বরং আইএসআইএস সহ এসব সশস্ত্র সংগঠনগুলো হচ্ছে বেসামরিক বাহিনী (militias), যাদের না আছে কোন রাষ্ট্র উপাদান কিংবা না আছে কোন শাসন-কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্র অথবা নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা। সুতরাং আইএসআইএস কর্তৃক খিলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ফাঁকাবুলি ছাড়া আর কিছুই না। তাই বিষয়টি পর্যবেক্ষণেরও যোগ্য নয় কারণ তা সুস্পষ্ট দৃশ্যমান...

৫. বরং এই ঘোষণার ফলে সাধারণ জনগণের মধ্যে খিলাফত ব্যবস্থা সম্পর্কে যে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তা গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করা জরুরী; কারণ খিলাফত সম্পর্কে মুসলিমদের মধ্যে যে সুউচ্চ ধারণা এবং এর মহান তাৎপর্য প্রতিষ্ঠিত ছিল তাকে ভেঙ্গে চুর্ণবিচুর্ণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। একে দুর্বল মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তিদের চিন্তার পর্যায়ে নামানো হয়েছে। সহজভাবে বললে এটা হচ্ছে কিছু ব্যক্তির হতাশা নির্গমন করার একটি মাধ্যম। এমন যেন, তাদের কেউ একজন একটি খোলা ময়দানে কিংবা কোন এক গ্রামে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিবে আমি খলীফা এবং তারপর সে এটা ভেবে নির্বাসিত হবে যে, আহ্‌ দারুন কিছু করলাম!

এতে খিলাফতের গুরুত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব দুটোই হারাবে, এর সুউচ্চ ধারণাটি ক্ষয় হতে থাকবে; এবং খিলাফত শুধুমাত্র একটি মিষ্টি কথায় পরিণত হবে, যা সকলের মুখে মুখে কথিত থাকবে কিন্তু ভেতরটা ফাঁকা। এসবই ঘটছে এমন একটি সময়ে, যখন পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় খিলাফত প্রতিষ্ঠার সময় ঘনিয়ে এসেছে, এবং মুসলিমরা ব্যাকুল হয়ে এর অপেক্ষায় আছে। এবং আরও তারা প্রত্যক্ষ করছে **হিযবুত তাহ্‌রীর** রাসূল (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথে এগিয়ে যাচ্ছে, যেভাবে তিনি (সাঃ) মদীনা আল-মুনাওওয়ারাতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন..., এবং উম্মাহ্ ও **হিযব্**-এর মধ্যে প্রাণবন্ত ও অর্থবহ ব্যাপক গণসংযোগ আর উম্মাহ্'র পক্ষ থেকে অভুতপূর্ব সাড়া।

সুতরাং মুসলিমরা এই গণসংযোগ থেকে ইসলামে ভ্রাতৃত্বের প্রকৃত অর্থ, খিলাফত প্রতিষ্ঠায় **হিযব্**-এর সাফল্যের আনন্দ এবং উম্মাহ্'র সঠিক তত্ত্বাবধানের সাথে তারাও যে শরিক, এবং তা নবুয়্যতের আদলে প্রকৃত (genuine) খিলাফত, সেটা অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে... ঠিক এমনই একটি সময়ে খিলাফতের ঘোষণা এলো, যা সাধারণ জনগণের চিন্তায় খিলাফত সম্পর্কে প্রকৃত বাস্তবতার বদলে একটি অস্পষ্ট এমনকি ধ্বংসাত্মক চিত্র দিবে...

৬. এসব কিছু থেকে একটা না অনেকগুলো প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে... এই ঘোষণা এলো এমন সময়সীমায় যখন ঘোষণাকারীদের হাতে কোন শাসন-কর্তৃত্ব নাই যা দ্বারা তারা আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে। মুলতঃ তারা ফেসবুক এবং মিডিয়াতে ঘোষণা দিয়েছে... এটা সন্দেহজনক। বিশেষ করে এই সশস্ত্র সংগঠনগুলো যেহেতু কোন আদর্শিক প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেনি তাই এগুলো সহজেই প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্যের বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদানের সহজ অনুপ্রবেশের অনুমোদন দেয়। এবং আমরা সবাই জানি প্রাচ্য এবং প্রাশ্চাত্য ইসলাম এবং খিলাফতের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এবং এটাও সুপ্রতিষ্ঠিত যে তারা এর স্বরূপকে ধ্বংসের চক্রান্তে লিপ্ত কারণ তারা এর নাম-নিশানা মুছে ফেলতে পারেনি। খিলাফত যাতে শুধুমাত্র মূল্যহীন নামসর্বস্ব হিসেবে অবশিষ্ট থাকে, সে বিষয়ে তারা সজাগ। তাই যে শক্তিশালী ঘোষণা শুনে কাফিররা স্তম্ভিত হওয়ার কথা বরং তা এখন শত্রুদের জন্য এক হাস্য-কৌতুকের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

৭. যদিও তাদের এ সমস্ত কার্যক্রম ক্ষতিকর, তারপরও আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা দিয়ে ইসলামের শত্রু প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্যকে, তাদের দালালদের এবং তাদের অজ্ঞ অনুসারীদেরকে বলিষ্টভাবে জানাতে চাই যে পৃথিবীকে শতশত বছর ধরে নেতৃত্বদানকারী খিলাফত সবার নিকট সু-পরিচিত এবং অজানা নয়, শত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের পরও দুর্ভেদ্য। **"তারা চক্রান্ত করে, এবং আল্লাহ্‌ও কৌশল করেন; কিন্তু আল্লাহ্ সর্বোত্তম কৌশলী।"** [সূরা আল-আনফা'ল : ৩০]

সর্বশক্তিমান, সর্ব বিজয়ী আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য একটি দলকে পথপ্রদর্শন করেছেন, যার সদস্যদের না কেনা-বেচা করা যায়, না তাদেরকে আল্লাহ্'র স্মরণ থেকে বিচ্যুত করা যায়। তারা খিলাফতকে তাদের চিন্তায়-শ্রবনে-দৃষ্টিতে ধারণ করেছে, তারা এর জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে, এবং শাসন ও প্রশাসনিক কাঠামো সহ এর আইন-কানুন (আহ্‌কাম) এবং এর সংবিধান ইসলামের উৎস হতে বের করেছে। তারা হুবহু নবুয়্যতের আদলে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়পথে এগিয়ে এসেছে...

আল্লাহ্'র ইচ্ছায় তারা হচ্ছে সেই ঢাল যা যেকোন ধ্বংসকে প্রতিরোধ করে, তারা হচ্ছেন সেই পাথর যা দ্বারা কাফের, তাদের দালালেরা ও তাদের অজ্ঞ অনুসারীদের চক্রান্ত ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়। পরাক্রমশালী আল্লাহ্'র ইচ্ছায়, তারা সচেতন রাজনীতিবিদ যারা ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদের চক্রান্তকে চূর্ণবিচূর্ণ করে, এবং এটা তাদের কাছেই ফিরিয়ে দেয়, **"কিন্তু কুচক্র, কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে।"** [সূরা ফাতির : ৪৩]

হে আমার প্রিয় ভাই এবং বোনেরা,

ইসলামী খিলাফতের বিষয়টি একটি মহান এবং বৃহৎ ব্যাপার, এবং তা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রতারক গণমাধ্যমগুলোর নিছক কোন সংবাদ হবেনা বরং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইচ্ছায় তা হবে এমন এক ভূমিকম্প যা ভূ-রাজনীতির ভারসাম্যকে প্রকম্পিত করবে এবং ইতিহাসের চেহারা এবং গতিপথকে পাল্টে দিবে...

এবং রাসূল (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী নবুয়্যতের আদলেই আবার খিলাফত ফিরে আসবে এবং এর প্রতিষ্ঠাকারীরা প্রথম খোলাফায়ে রাশেদার মতই খোদাভীরু এবং সাচ্চা হবে, উম্মাহ্ তাদেরকে ভালবাসবে এবং তারাও উম্মাহ্'কে ভালবাসবে, এবং উম্মাহ্ তাদের জন্য দো'আ করবে তারাও উম্মাহ্'র জন্য দো'আ করবে, এবং উম্মাহ্ তাদের সাথে সাক্ষাতে আনন্দিত হবে এবং তারাও উম্মাহ্'র সাথে সাক্ষাতে আনন্দিত হবে। এমন হবে না যে উম্মাহ্ তাদের উপস্থিতিকে ঘৃণা করবে...

নবুয়্যতের আদলে আগত খিলাফতের প্রতিষ্ঠাকারীগণ এরকমই হবেন। যারা এর জন্য উপযুক্ত আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকেই তা দিবেন, এবং আমরা আল্লাহ্'র নিকট দো'আ করি যেন তিনি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন, এবং আমরা আল্লাহ্'র নিকট দো'আ করি যেন তিনি আমাদেরকে তা প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দেন, **"সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সেই লেনদেনের উপর.."** [সূরা আত-তওবা : ১১১]

আল্লাহ্'র রহমত হতে হতাশ হবেন না। আল্লাহ্ আপনাদের কোন প্রচেষ্টাকে বৃথা করবেন না, না তাঁর নিকট যে দো'আ আপনারা করেছেন তা প্রত্যাখ্যান করবেন, না তাঁর উপর যে ভরসা আপনারা ন্যস্ত করেছেন তা ছুঁড়ে ফেলবেন। সুতরাং, আমাদেরকে সাহায্য করুন আরও প্রচেষ্টার মাধ্যমে, ন্যায়নিষ্ঠার মাধ্যমে, যাতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের ন্যায়নিষ্ঠাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। এবং এসব ফাঁকাবুলিসর্বস্ব ঘটনা-রটনাকে পাত্তা দিয়ে আপনাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের গতি কমিয়ে ফেলবেন না।

আশা করি এই উত্তরটি যথেষ্ট। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের সফলতা দান করুক এবং সাহায্য করুক। এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করুক।

ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্ ওয়া বারাকা'তুহু

আপনাদের ভাই,

আতা বিন খলিল আবু আল-রাশ্‌তা

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর আমীর

০৩ রমযান ১৪৩৫ হিজরী
০১ জুলাই, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

ধারাবাহিক নির্বাচিত নিবন্ধঃ গত সংখ্যার পর থেকে...

খিলাফত রাষ্ট্রের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

(শাসন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা)

খলীফা নিয়োগ করা ও বাই'আত প্রদানের জন্য গৃহীত বাস্তব পদক্ষেপসমূহ

বাই'আত প্রদানের পূর্বে খলীফা নিয়োগের বাস্তব পদক্ষেপসমূহ বিভিন্ন রকম হতে পারে। যে রকমটি হয়েছিল খোলাফায়ে রাশেদীনদের সময়ে, যারা আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) এর ইন্তিকালের পরপরই উম্মাহ্'র খলীফা হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন – যেমন: আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী (রা.)। এ সমস্ত পদক্ষেপের ব্যাপারে সকল সাহাবী (রা.) নীরব থেকে তাঁদের স্বীকৃতি ও সম্মতি প্রদান করেছিলেন। এ বিষয়সমূহ যদি শারী'আহ্ সম্মত না হত তাহলে তাঁরা তা কোনক্রমেই মেনে নিতেন না। কারণ, এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার উপর মুসলিমদের মর্যাদা ও শারী'আহ্ হুকুম-আহ্কাম বাস্তবায়ন নির্ভর করে। আমরা যদি খোলাফায়ে রাশেদীনদের নিয়োগের বিভিন্ন ধাপসমূহের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, বনু সা'ইদার প্রাঙ্গনে কিছু মুসলিমের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। (আল্লাহ্'র রাসূলের (সাঃ) পর) সম্ভাব্য খলীফা হিসাবে সা'দ, আবু উবাইদাহ্, উমর ও আবু বকর (রা.) প্রাথমিকভাবে মনোনীত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে, উমর ও আবু উবাইদাহ্ (রা.) আবু বকর (রা.) কে চ্যালেঞ্জ করতে অস্বীকৃতি জানান। অর্থাৎ, বিষয়টি তখন সা'দ এবং আবু বকর (রা.) মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। অনেক তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার পর আবু বকর (রা.) কে খলীফা হিসাবে বাই'আত দেয়া হয়। পরদিন মুসলিমদেরকে মসজিদে আহ্বান করা হয় এবং তারা সেখানে আবু বকর (রা.) কে বাই'আত দেয়। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, বনু সা'ইদার প্রাঙ্গনের বাই'আতটি ছিল খলীফা হিসাবে নিয়োগের বাই'আত – যার মাধ্যমে আবু বকর (রা.) মুসলিমদের খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হন। আর তার পরের দিন, মসজিদে গৃহীত বাই'আতটি ছিল আনুগত্যের বাই'আত।

আবু বকর (রা.) যখন বুঝতে পারলেন যে তাঁর অসুস্থতা তাঁকে ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে ধাবিত করছে, ঠিক সে সময়ে মুসলিম সেনাবাহিনী পারস্য ও রোমান পরাশক্তিগুলোর সাথে যুদ্ধ করছিল। তখন তিনি তাঁর মৃত্যুর পর কে খলীফা হবেন এ ব্যাপারে মুসলিমদের সাথে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তিনি প্রায় ৩ মাস ব্যাপী মদীনার মুসলিমদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে যখন তিনি অধিকাংশ মুসলিমের মনোভাব বুঝতে পারলেন, তখন তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে তিনি উমর (রা.) এর নাম ঘোষণা করলেন। তবে, তাঁর এই মনোনয়ন উমরকে তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসেবে নিয়োগের চূড়ান্ত চুক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়নি। কারণ, আবু বকরের মৃত্যুর পর মুসলিমরা মসজিদে এসে উমর (রা.) কে বাই'আত দেয় এবং এভাবেই খলীফা হিসাবে তাঁর নিয়োগ চূড়ান্ত হয়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, উমর (রা.) শুধুমাত্র বাই'আতের মাধ্যমেই খলীফা হয়েছিলেন; মুসলিমদের সাথে আবু বকর (রা.) এর আলাপ-আলোচনা বা তাঁর মনোনয়নের মাধ্যমে নয়। যদি আবু বকর (রা.) এর মনোনয়নই খলীফা নিয়োগের চূড়ান্ত চুক্তি হত, তাহলে উমর (রা.) কে মুসলিমদের বাই'আত দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং, এ ঘটনা আমাদের স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে যে, মুসলিমদের বাই'আত ছাড়া কেউ খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হতে পারবে না।

খলীফা থাকাকালীন সময়ে উমর (রা.) যখন গুরুতরভাবে আহত হলেন তখন মুসলিমরা তাঁকে একজন খলীফা মনোনীত করার জন্য অনুরোধ করলেন; কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু, এ ব্যাপারে তাদের ক্রমাগত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ছয়জনকে খলীফা পদের জন্য মনোনীত করেন। অতঃপর তিনি শুয়াইব (রা.) কে ইমাম নিযুক্ত করলেন এবং তাঁর মনোনীত ছয়ব্যক্তিকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে (তাঁর মৃত্যুর) তিনদিনের মধ্যে শুয়াইব (রা.) কে খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিলেন। উমর (রা.), শুয়াইব (রা.) কে বললেন, "...যদি (ছয়জনের মধ্যে) পাঁচজন একব্যক্তির (খলীফা হবার) ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে এবং একজন দ্বিমত পোষণ করে তাহলে তরবারি দিয়ে তার মস্তক উড়িয়ে দেবে...।" এ ঘটনাটি তাবারাণী তার তা'রিখ গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন; এছাড়া, আরও উল্লেখিত আছে ইবন কুতাইবা'র গ্রন্থ আল ইমামা ও সিয়াসাহ, যা কিনা 'খিলাফতের ইতিহাস' (দ্যা হিস্ট্রি অফ খিলাফাহ্) নামে পরিচিত এবং ইবন সা'দ এর গ্রন্থ আত-তাবাকাত আল-কুবরাহ্'তে। তারপর উমর (রা.) আবু তাল্‌হা আল-আনসারীকে পঞ্চাশ জন ব্যক্তির সহায়তায় তাঁর মনোনীত ছয়ব্যক্তির নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন এবং সেই সাথে, আল মিকদাদ ইবনে আল-আসওয়াদকে উক্ত ছয়প্রার্থীর মিলিত হবার স্থান নির্ধারণের দায়িত্ব দিলেন। উমর (রা.) এর মৃত্যুর পর তাঁর মনোনীত ছয় ব্যক্তি একত্রিত হলেন। এরপর, আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) তাদের প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচিত করার জন্য কে নিজেকে এ পদ থেকে সরিয়ে নিতে চাও?" এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে নিশ্চুপ থাকলে তিনি বললেন, "আমি স্বেচ্ছায় খলীফার পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছি।" তারপর তিনি এক এক করে প্রত্যেকের সাথে আলাদাভাবে আলোচনা করলেন। তিনি প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলেন, "নিজেকে ছাড়া ছয়জনের মধ্যে আর কাকে তুমি এ পদের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি বলে মনে কর?" তাদের সকলের উত্তর আলী (রা.) এবং উসমানের (রা.) মধ্যে সীমাবদ্ধ হল। এরপর, আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) এ দু'জনের মধ্যে কাকে জনগণ খলীফা নির্বাচিত করতে চায়, সে বিষয়ে মতামত সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। জনমত যাচাই এর জন্য তিনি মদীনার নারী-পুরুষ সবাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং খলীফা নির্বাচনের এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি দিনরাত কাজ করেছিলেন। আল মুসওয়ার ইবনে মাখরামা'র বরাত দিয়ে আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, "রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর আব্দুর রহমান বিন আউফ আমার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ছিল যে পর্যন্ত না আমি জেগে উঠলাম। তিনি বললেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি ঘুমাচ্ছো, কিন্তু আল্লাহ্'র কসম, গত তিন রাত আমি খুব কমই ঘুমের আনন্দ উপভোগ করেছি।" এরপর মদীনার জনগণ ফজরের সালাত আদায় করার পর উসমান (রা.) কে খলীফা হিসেবে বাই'আত দিল এবং এভাবেই তিনি মুসলিমদের বাই'আতের মাধ্যমে খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হলেন। সুতরাং, উসমান (রা.) মুসলিমদের বাই'আতের মাধ্যমেই খলীফা হয়েছিলেন, উমর (রা.) কর্তৃক মনোনয়নের মাধ্যমে নয়।

উসমান (রা.) নিহত হওয়ার সময় মদীনার সাধারণ জনগণ এবং কুফাবাসী আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) কে খলীফা হিসেবে বাই'আত দেন। এভাবে তিনিও মুসলিমদের বাই'আতের মাধ্যমে খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হন।

সাহাবীদের (রা.) বাই'আত দেয়ার প্রক্রিয়াকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, প্রথমে জনগণের কাছে খলীফা পদপ্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হতো এবং এদের প্রত্যেককে অবশ্যই খলীফা হবার আবশ্যিক শর্তাবলী পূরণ করতে হত। তারপর উম্মাহ্'র প্রভাবশালী ব্যক্তি – যারা উম্মাহ্'কে প্রতিনিধিত্ব করতেন তাদের মতামত সংগ্রহ করা হত। খোলাফায়ে রাশেদীনদের সময়ে উম্মাহ্'র প্রতিনিধি ছিলেন সাহাবা (রা.) কিংবা মদীনার অধিবাসীগণ। যে ব্যক্তি সাহাবীদের (রা.) অথবা অধিকাংশ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন, তাকেই বাই'আত দেয়া হত এবং তার আনুগত্য করা তখন মুসলিমদের উপর ফরয হয়ে যেত। এভাবেই মুসলিমরা খলীফাকে আনুগত্যের বাই'আত প্রদান করতো এবং তাদের নির্বাচিত খলীফাই শাসন ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে উম্মাহ্'র প্রতিনিধি হয়ে যেতেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনদের (রা.) বাই'আত দেবার ঘটনাসমূহ থেকে মূলতঃ এ বিষয়গুলোই বোঝা যায়। এছাড়া, উমর (রা.) এর ছয়জন ব্যক্তি মনোনীত করার বিষয়টি এবং উসমান (রা.) কে বাই'আত দেবার সময় যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছিল, তা থেকে আরও দু'টি বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। আর তা হল, প্রথমত একজন অন্তর্বর্তীকালীন আমীর (নেতা) এর উপস্থিতি, যিনি নতুন খলীফা নির্বাচিত হওয়া কালীন সময় উম্মাহ্'র দায়িত্বে থাকবেন এবং দ্বিতীয়ত খলীফার জন্য মনোনীত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছয়জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।

অন্তর্বর্তীকালীন আমীর

একজন খলীফার কাছে তার মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে কিংবা খলীফার পদ শূন্য হবার মত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে নতুন খলীফা নির্বাচিত হওয়া কালীন সময়ে মুসলিমদের বিষয়াবলী দেখশুনা করার জন্য একজন অন্তর্বর্তীকালীন আমীর নিয়োগ করার ক্ষমতা খলীফার রয়েছে। পূর্ববর্তী খলীফার মৃত্যুর পর তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং তার প্রধান কাজ হবে তিনদিনের ভেতর নতুন খলীফা নির্বাচিত করা।

নতুন কোন আইন গ্রহণ করবার ক্ষমতা অন্তর্বর্তীকালীন খলীফার নেই। কারণ, এটি কেবলমাত্র উম্মাহ্'র বাই'আতের মাধ্যমে নির্বাচিত খলীফার জন্য সংরক্ষিত। খলীফা পদের জন্য মনোনীতদের মধ্য হতে কেউ অন্তর্বর্তীকালীন আমীর হতে পারবেন না কিংবা মনোনীতদের কাউকে তিনি সমর্থন করতে পারবে না। কারণ, উমর (রা.) তাঁর মনোনীত ছয়জনের মধ্য হতে কাউকে অন্তর্বর্তীকালীন আমীর হিসেবে নিয়োগ দেননি।

নতুন খলীফা নির্বাচিত হওয়া মাত্রই অন্তর্বর্তীকালীন আমীরের কার্যকাল শেষ হয়ে যাবে, কারণ তার মেয়াদ অস্থায়ী এবং দায়িত্ব একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের (নতুন খলীফা নির্বাচিত করা) মধ্যেই সীমিত।

শুয়াইব (রা.) যে উমর (রা.) কর্তৃক নির্বাচিত অন্তর্বর্তীকালীন আমীর ছিলেন তা উমর (রা.) এর মনোনীত ছয়ব্যক্তি সম্পর্কিত উক্তি থেকে বোঝা যায়: "যে তিনদিন তোমরা আলোচনা করবে সে সময় শুয়াইব তোমাদের সালাতে ইমামতি করবে।" এরপর তিনি বলেছিলেন, "...যদি (ছয়জনের মধ্যে) পাঁচজন একব্যক্তির (খলীফা হবার) ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছে এবং একজন দ্বিমত পোষণ করে তাহলে তরবারি দিয়ে তার মস্তক উড়িয়ে দেবে...।" এটা প্রমাণ করে যে, শুয়াইব (রা.) কে তাদের উপর কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছিল। এছাড়া, শুয়াইব (রা.) কে সালাতের ইমামও নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সে সময়ে সালাতে ইমামতির অর্থ ছিল জনগণের উপরও ইমাম (নেতা) নিযুক্ত হওয়া। এছাড়া, তাঁকে শাস্তি প্রদানের (মস্তক উড়িয়ে দেয়ার) ক্ষমতাও দেয়া হয়েছিল এবং আমরা জানি যে, একমাত্র আমীরই কোন ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করার ক্ষমতা রাখেন।

আমীর নির্বাচনের এ ঘটনাটি একদল সাহাবীদের সম্মুখেই ঘটেছিল এবং এ বিষয়ে তারা কেউ কোন দ্বিমত পোষণ করেননি। সুতরাং, এটি ইজমা আস-সাহাবা বা সাহাবীগণের ঐক্যমত যে, নতুন খলীফা নির্বাচিত হবার পূর্বে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে উম্মাহ্'র বিষয়াবলী এবং নতুন খলীফা নিযুক্ত করার প্রক্রিয়া সমূহ দেখাশুনা করার জন্য একজনকে আমীর নিযুক্ত করার ক্ষমতা খলীফার রয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, খলীফা তার জীবদ্দশায় রাষ্ট্রের সংবিধানে এ অনুচ্ছেদটি সংযুক্ত করতে পারেন যে, যদি কোন খলীফা অন্তর্বর্তীকালীন আমীর নিযুক্ত না করেই ইন্তেকাল করেন, তবে একজনকে অবশ্যই অন্তর্বর্তীকালীন আমীর হিসাবে নিযুক্ত করতে হবে।

একইভাবে আমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, খলীফার শাসনকালের শেষের দিকে যদি তার পক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন আমীর নিয়োগ করা সম্ভব না হয়, তবে খলীফার পরবর্তী জ্যেষ্ঠ্য প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী (Next Eldest Delegated Assistant) অন্তর্বর্তীকালীন আমীর হবেন যদি না তাকে খলীফা পদের জন্য মনোনীত করা হয়। যদি তিনি খলীফা পদের জন্য মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হন, তাহলে তার পরবর্তী জ্যেষ্ঠ্য প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী অন্তর্বর্তীকালীন আমীর হবেন। যদি খলীফার সব প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীই পরবর্তী খলীফা পদের জন্য মনোনীত হন, তবে খলীফার জ্যেষ্ঠ্য নির্বাহী সহকারীকে আমীর নিযুক্ত করা হবে এবং পূর্বের মতোই ব্যাপারটি চলতে থাকবে। যদি উল্লেখিত সকলেই মনোনীত হন তবে কনিষ্ঠ নির্বাহী সহকারী অন্তর্বর্তীকালীন আমীর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন।

যদি খলীফাকে কোন কারণে তার পদ থেকে অপসারণ করা হয় তাহলেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রেও একইভাবে খলীফার জ্যেষ্ঠ্য প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী অন্তর্বর্তীকালীন আমীর হবেন, যদি না তিনি মনোনীতদের মধ্যে কেউ হন। আর, যদি তিনি মনোনীতদের একজন হন তাহলে তার পরবর্তী জ্যেষ্ঠ্য প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী আমীর নিযুক্ত হবেন এবং এভাবে প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীদের শেষব্যক্তি পর্যন্ত ব্যাপারটি চলতে থাকবে। প্রতিনিধিত্ব সহকারীদের সকলেই মনোনীত হলে, জ্যেষ্ঠ্য নির্বাহী সহকারী আমীর হবেন এবং পূর্বের মতোই ব্যাপারটি চলতে থাকবে। যদি উল্লেখিত সকলেই মনোনীত হন তবে কনিষ্ঠ নির্বাহী সহকারী অন্তর্বর্তীকালীন আমীর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন।

খলীফা যদি শত্রুর হাতে বন্দী হন সেক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। তবে, এক্ষেত্রে খলীফাকে উদ্ধার করার কোন সম্ভাবনা না থাকলে অন্তর্বর্তীকালীন আমীরের নির্বাহী ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ থাকতে হবে। এ বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা যথাযথ সময়ে উম্মাহ্'র কাছে উপস্থাপন করা হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই অন্তর্বর্তীকালীন আমীর খলীফা জিহাদে বা ভ্রমণে যাবার সময় যে ধরনের ডেপুটি বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেন সেরকম কিছু নয়। রাসূল (সাঃ) যখন জিহাদে বা হিজ্জাত আল ওয়াদাতে যেতেন তখন এ রকম ডেপুটি নিয়োগ করতেন। জনগণের বিষয়াদি দেখাশুনা করার জন্য যতটুকু নির্বাহী ক্ষমতার দরকার হয়, সাধারণত এ ধরনের ডেপুটি খলীফা কর্তৃক ততটুকু নির্বাহী ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

মনোনীতদের তালিকা সংক্ষিপ্তকরণ

খোলাফায়ে রাশেদীনদের খলীফাপদে নিযুক্ত করার প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানে মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকা সংক্ষিপ্তকরণের একটি বিষয় ছিল। বানু সা'ইদার প্রাঙ্গনে মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর (রা.), উমর (রা.), আবু উবাইদাহ (রা.) এবং সা'দ বিন উবাদাহ্

(রা.)। কিন্তু, উমর (রা.) এবং আবু উবাইদাহ (রা.) নিজেদেরকে আবু বকরের (রা.) সমতুল্য মনে করেননি, এজন্য তাঁরা আবু বকরকে চ্যালেঞ্জও করেননি। এ কারণে প্রতিযোগিতা আবু বকর ও সা'দ বিন উবাদাহ্‌র মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে, বানু সাইদা'র প্রাঙ্গণে উপস্থিত মদীনার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ আবু বকরকে বাই'আত দিয়ে খলীফা হিসাবে নির্বাচিত করলেন এবং এর পরদিন জনগণ আবু বকর (রা.) কে আনুগত্যের বাই'আত দিলেন।

আবু বকর (রা.) শুধুমাত্র উমর (রা.) কে তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। এ পদের জন্য তিনি অন্য আর কাউকেই মনোনীত করে যাননি। পরবর্তীতে, মদীনার মুসলিমরা প্রথমে উমরকে নিযুক্তির বাই'আত ও পরে আনুগত্যের বাই'আত প্রদান করে।

উমর (রা.) ছয়ব্যক্তিকে খলীফা পদের জন্য মনোনীত করেছিলেন এবং খিলাফতকে এদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছিলেন। সেইসাথে, তিনি জনগণকে ছয়জনের মধ্য হতে একজনকে পছন্দ করবার সুযোগ দিয়েছিলেন। মনোনীতদের মধ্য হতে আব্দুর রহমান (রা.) নিজেকে এ পদ থেকে সরিয়ে নিয়ে বাকী পাঁচজনের সাথে একান্তে আলোচনা করে সংখ্যাটি দুইয়ে নামিয়ে এনেছিলেন – এরা ছিলেন আলী (রা.) এবং উসমান (রা.)। পরবর্তীতে জনগণের মতামত যাচাই-বাছাই এর পর উসমান (রা.) দিকে পাল্লা ভারী হয় এবং উসমান (রা.) মুসলিমদের খলীফা নিযুক্ত হন।

আলী (রা.) কে খলীফা হিসাবে নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে সে সময় খলীফা পদের জন্য আর কেউ মনোনীত না হওয়ায় মদীনা ও কুফার অধিকাংশ মুসলিম তাঁকেই বাই'আত দেয়। আর, এভাবেই তিনি চতুর্থ খলীফা হিসাবে নিযুক্ত হন।

যেহেতু উসমান (রা.) কে খলীফা হিসাবে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে (শারী'আহ্) অনুমোদিত সর্বোচ্চ সময়ের সবটুকুই নেয়া হয়েছিল; অর্থাৎ, তিনদিন ও এই দিনগুলোর মধ্যবর্তী দুই রাত এবং মনোনীত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছয়জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত করে দুই ব্যক্তিতে নামিয়ে আনা হয়েছিল, সেহেতু গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে সঠিকভাবে বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা বিস্তারিতভাবে এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করবো :

১. ২৩ হিজরীর জিলহজ্ব মাস শেষ হবার চারদিন আগে বুধবার ভোরে মিহরাবে নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় উমর (রা.) কে ছুরিকাঘাত করা হয়। অভিশপ্ত আবু লু'লুয়া'র ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে ২৪ হিজরীর মহররম মাসের প্রথমদিন রবিবার সকালে উমর (রা.) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। উমর (রা.) এর ইচ্ছা অনুসারে শুয়াইব (রা.) তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান।

২. উমর (রা.) এর দাফনের পর, তাঁর পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুসারে আল মিকদাদ (রা.) উমরের মনোনীত ছয়ব্যক্তিকে একটি বাড়ীতে একত্রিত করেন; যাদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব ছিল আবু তাল্‌হা'র উপর। এরপর, তাঁরা একে অন্যের সাথে আলোচনায় বসেন। পরবর্তীতে তাঁরা আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) কে তাঁদের মধ্য হতে এবং তাঁদের সম্মতিক্রমে খলীফা নির্বাচিত করার ব্যাপারে প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেন।

৩. আব্দুর রহমান (রা.) তাঁদের সাথে একান্তে আলোচনা করেন এবং প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলেন, "নিজেকে ছাড়া ছয়জনের মধ্যে আর কাকে তুমি এ পদের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি বলে মনে কর?" তাঁদের উত্তর আলী (রা.) এবং উসমানের (রা.) মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছিল। এভাবে আব্দুর রহমান (রা.) বিষয়টি ছয়ব্যক্তি থেকে বিষয়টি দুইব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন।

৪. এরপর আব্দুর রহমান (রা.) মদীনার জনগণের সাথে আলোচনা করা শুরু করেন।

৫. বুধবার রাতে, অর্থাৎ (রবিবার) উমর (রা.) ইন্তেকালের পর তৃতীয় দিন রাতে আব্দুর রহমান তাঁর ভাতিজা আল মুসওয়ার ইবনে মাখরামার বাড়িতে গেলেন। এ বিষয়ে ইবনে কাসীর তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াতে বর্ণনা করেছেন যে :

"যখন উমরের মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনের রাত শুরু হল আবদূর রহমান তাঁর ভাতিজা আল মুসওয়ার ইবনে মাখরামার বাড়িতে গেলেন এবং বললেন, "দেখতে পাচ্ছি তুমি ঘুমাচ্ছো, কিন্তু আল্লাহ্'র কসম! গত তিনরাত আমি খুব কমই ঘুমের আনন্দ উপভোগ করেছি।" তিনরাত মানে রবিবার সকালে উমর (রা.) মারা যাবার পরে অর্থাৎ, সোম, মঙ্গল ও বুধবারের রাত। তারপর তিনি বললেন, "...যাও আলী এবং উসমানকে ডেকে নিয়ে এসো...", তারপর তিনি তাঁদেরকে (আলী ও উসমানকে) মসজিদে ডেকে নিয়ে আসলেন এবং জনসাধারণকে নামাজের জন্য ডাকা হলো। এটা ছিল বুধবার ভোরের ঘটনা। তারপর তিনি আলী (রা.) এর হাত ধরলেন এবং তাঁকে আল্লাহ্'র কিতাব, রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ ও আবু বকর ও উমর (রা.) এর কর্মের উপর বাই'আত করতে বললেন। আলী (রা.) তাঁকে তার সেই বিখ্যাত উত্তরটি দিলেন, "আল্লাহ্'র কিতাব ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্‌র উপর আমি বাই'আত নিলাম। কিন্তু, আবু বকর ও উমরের কর্মের বিষয়ে তিনি বললেন যে, এ সকল বিষয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব ইজ্‌তিহাদ প্রয়োগ করবেন। এ কথা শুনার পর আব্দুর রহমান, আলীর হাত ছেড়ে দিলেন। এরপর, আব্দুর রহমান বিন আউফ, উসমান (রা.) এর হাতটি ধরলেন ও তাঁকেও একই কথা বলতে বললেন। উসমান (রা.) বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহ্'র নামে।' এভাবে উসমান (রা.) এর বাই'আত সম্পন্ন হল।

শুয়াইব (রা.) সেদিনের ফযর ও জোহরের নামাযে ইমামতি করলেন। এরপর, উসমান (রা.) মুসলিম উম্মাহ্'র খলীফা হিসেবে আসর থেকে ইমামতি শুরু করলেন। এর অর্থ হচ্ছে, যদিও উসমান (রা.) ফজরের সময় নিযুক্তির বাই'আত পেয়েছিলেন, কিন্তু মদীনার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের বাই'আত পাবার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিমদের আমীর হিসেবে শুয়াইব (রা.) এর কর্তৃত্বই বহাল ছিল। প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের বাই'আত দেবার পর্ব শেষ হয়েছিল মূলতঃ আসরের কিছু আগে, যখন সাহাবারা উসমান (রা.) কে বাই'আত দেয়ার ব্যাপারে একে অপরকে আহ্বান করছিলেন। আসরের কিছুকাল পূর্বে বাই'আত গ্রহণ পর্ব শেষ হয়ে যাবার সাথে সাথে আমীর হিসাবে শুয়াইব (রা.) এর কার্যকালও শেষ হয়ে যায় এবং আসরের নামায থেকে উম্মাহ্'র খলীফা হিসাবে উসমান (রা.) ইমামতি শুরু করেন।

'আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থের রচয়িতা ব্যাখ্যা করেছেন, কেন উসমান (রা.) ফজরের সময় বাই'আত নেয়া সত্ত্বেও শুয়াইব (রা.) জোহরের নামাযে ইমামতি করেছিলেন। এ বিষয়ে তার ব্যাখ্যা হল: "কিছু মানুষ মসজিদে উসমানকে বাই'আত দেয়ার পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মাজলিশ আশ্-শুরা ভবনে (যেখানে শুরা কমিটির লোকজন মিলিত হতেন)। সেখানে বাকীরা তাঁকে বাই'আত দেয়। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, জোহর

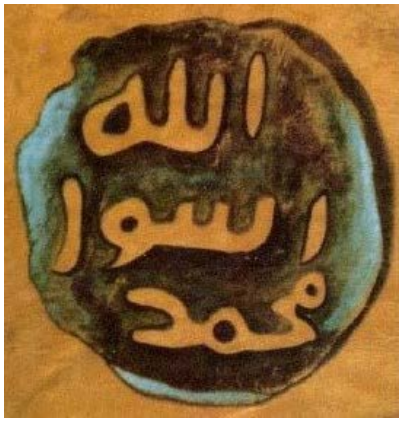

নামায অতিক্রান্ত হবার পরও উসমানের বাই'আত গ্রহণ পর্ব চলছিল। আর, এ কারণেই মসজিদে নববীতে জোহরের নামাযে শুয়াইব (রা.) ইমামতি করেছিলেন। সুতরাং, মুসলিম উম্মাহ্'র খলীফা হিসাবে উসমান (রা.) প্রথম যে নামাযে ইমামতি করেছিলেন তা ছিল আসরের নামায।"

বিভিন্ন বর্ণনা অনুসারে উমর (রা.) ছুরিকাহত হওয়ার দিন, আহত হবার পর তাঁর ইন্তিকালের দিন এবং উসমান (রা.) এর বাই'আতের দিনগুলোর ব্যাপারে কিছু মতপার্থক্য আছে। তবে, আমরা চেষ্টা করেছি দলিল-প্রমাণের দিক থেকে যেটি সবচাইতে শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য সেটি উপস্থাপন করতে।

উপরোক্ত আলোচনা অনুসারে, (খলীফার ইন্তিকাল কিংবা অপসারণের মাধ্যমে) খলীফার পদ শূন্য হওয়ার পর নতুন খলীফা মনোনয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াবলীর প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে :

১. খলীফা নিয়োগের কাজটি দিন-রাত ব্যাপী করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি সম্পন্ন হয়।

২. খলীফা নিযুক্ত হবার আবশ্যিক শর্তাবলী পূরণের মাধ্যমে মনোনীতদের তালিকা করতে হবে এবং এ বিষয়টি মূলতঃ পরিচালিত হবে মাহ্‌কামাতুল মাযালিমের মাধ্যমে।

৩. তারপর মনোনীতদের তালিকা সংক্ষিপ্ত করা হবে দু'বার: প্রথমে ছয় এবং পরে দুই। উম্মাহ্'র প্রতিনিধি হিসাবে মাজলিশ আল-উম্মাহ্ এই সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরীর কাজ করবে। এর কারণ হল, উম্মাহ্ উমর (রা.) কে তাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিল এবং উম্মাহ্'র প্রতিনিধি হিসাবেই তিনি সম্ভাব্য ছয়জনের তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। পরবর্তীতে, মনোনীত এই ছয়জন তাঁদের মধ্য হতে একজনকে অর্থাৎ, আব্দুর রহমান বিন আউফকে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিলেন। যিনি আবার আলোচনার ভিত্তিতে এই তালিকা সংক্ষিপ্ত করে তা দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছিলেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি পর্যায়ে উম্মাহ্'র প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই বিষয়টি সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং, এটি উম্মাহ্'র প্রতিনিধিত্বকারী মাজলিশ আল-উম্মাহ্'র কাজ।

৪. নতুন খলীফা নির্বাচনের ঘোষণার সাথে সাথে অন্তর্বর্তীকালীন আমীরের কার্যকাল শেষ হবে না; বরং বাই'আত গ্রহণ পর্ব পুরোপুরি সম্পন্ন হবার পর তার কার্যকাল শেষ হয়ে যাবে। কারণ, শুয়াইব (রা.) এর কার্যকাল উসমান (রা.) খলীফা নির্বাচিত হবার সাথে সাথে শেষ হয়নি; বরং বাই'আত গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হবার পরই তা শেষ হয়েছিল।

তিন দিন এবং এদের অন্তর্বর্তী রাত সমূহের ভেতর কিভাবে নতুন খলীফা নির্বাচিত করা যায় সে ব্যাপারে একটি বিল পাশ করা হবে। অবশ্য এটি ইতিমধ্যে কার্যকর হয়ে গেছে। ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা যথা সময়ে এটি উম্মাহ্'র কাছে উপস্থাপন করবো।

সুতরাং, মুসলিম উম্মাহ্'র যদি একজন খলীফা থাকে এবং কোন কারণে যদি তাকে অপসারণ করা হয় কিংবা তার মৃত্যু হয়, তবে এ সকল ক্ষেত্রে এ বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে। কিন্তু পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, মুসলিম উম্মাহ্'র উপর কোন খলীফা কর্তৃত্বশীল অবস্থায় নেই, তবে সেক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য শারী'আহ্ আইন বাস্তবায়ন করা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেবার জন্য তাদের উপর একজন খলীফা নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক হবে; ১৩৪২ হিজরীর ২৮ রজব তারিখে (১৯২৪ সালে ৩ মার্চ) ইস্তাম্বুলে খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় মুসলিমদের প্রতিটি ভূমিই খলীফা নিয়োগ দেবার জন্য উপযুক্ত, যে খলীফার উপর খিলাফত রাষ্ট্রের গুরুভার অর্পণ করা হবে। সুতরাং, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে কোন একটি দেশের জনগণ যদি কাউকে খলীফা হিসেবে বাই'আত দেয় এবং তার উপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তাহলে বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর উপর উক্ত খলীফাকে আনুগত্যের বাই'আত দেয়া ফরয হয়ে যাবে, অর্থাৎ তার শাসন-কর্তৃত্বকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করে নিতে হবে। তবে, এটি শুধুমাত্র উক্ত খলীফাকে তার নিজ ভূমির জনগণ বাই'আতের মাধ্যমে তার উপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করার পরেই কার্যকরী হবে। যাই হোক, উক্ত রাষ্ট্রকে (যে রাষ্ট্রে খলীফা নিয়োগ করা হবে) নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে:

১. উক্ত রাষ্ট্রের শাসন-কর্তৃত্ব অবশ্যই মুসলিমদের হাতে থাকতে হবে। এ শাসন-কর্তৃত্ব কোন কাফির-মুশরিক রাষ্ট্র কিংবা শক্তির অধীনস্থ হতে পারবে না।

২. উক্ত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ইসলামের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে অর্থাৎ দেশের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নিরাপত্তা অন্য সবকিছু ব্যাতীত শুধুমাত্র ইসলামের নামে হতে হবে এবং তা ইসলামী (মুসলিম) সেনাবাহিনীর হাতে থাকতে হবে।

৩. উক্ত রাষ্ট্রে ইসলামকে তাৎক্ষণিক, পূর্ণাঙ্গ এবং মৌলিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রমের সাথে খলীফাকে যুক্ত থাকতে হবে।

৪. খলীফাকে অবশ্যই নিয়োগের সকল আবশ্যিক শর্ত পূরণ করতে হবে, যদিও পছন্দনীয় শর্তসমূহ (preferred condition) পূরণ না করলেও চলবে।

যদি কোন রাষ্ট্র এ চারটি শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হয় তাহলে শুধুমাত্র তাদের বাই'আতের মাধ্যমেই খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাদের মাধ্যমেই খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজটি সম্পন্ন হবে। সেইসাথে, তাদের নির্বাচিত খলীফা হবেন উম্মাহ্'র বৈধ খলীফা এবং এ অবস্থায় তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বাই'আত প্রদান করা শারী'আহ্ সম্মত হবে না।

এরপর যদি অন্য কোন রাষ্ট্র কাউকে খলীফা হিসাবে বাই'আত দেয় তবে তা বাতিল বলে বিবেচিত হবে। কারণ রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"যদি দুই জন খলীফাকে বাই'আত দেয়া হয় তাহলে পরের জনকে হত্যা কর।" (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৫৩)

"প্রথমজনের বাই'আত সম্পূর্ণ কর, তারপরও প্রথমজনের।" (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৩৪৫৫)

"যে ব্যক্তি কোন ইমামকে বাই'আত প্রদান করল, সে যেন তাকে নিজ হাতের কর্তৃত্ব ও স্বীয় অন্তরের ফল (অর্থাৎ সব কিছু) দিয়ে দিল। এরপর তার উচিত উক্ত ইমামের আনুগত্য করা। যদি অন্য কেউ এসে (প্রথম নিযুক্ত) খলীফার সাথে (ক্ষমতার ব্যাপারে) বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে দ্বিতীয় জনের গর্দান উড়িয়ে দাও।" (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৪৪)

বাই'আতের প্রক্রিয়া

পূর্বের আলোচনায় আমরা খলীফা নিয়োগের ক্ষেত্রে বাই'আত-ই যে একমাত্র ইসলাম সম্মত প্রক্রিয়া সে ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছি। বাস্তবে বাই'আত প্রদান প্রক্রিয়াটি হাতে হাত মিলানো কিংবা লেখার মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত আছে যে, "যখন জনসাধারণ আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে সম্মত হল তখন আমি ইবনে উমরকে এটি লিখতে দেখেছি যে, 'আমি এই মর্মে লিখছি যে, আল্লাহ্'র কিতাব, রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ্ এবং আমার সাধ্যানুসারে আমি আমীর উল মু'মিনীন আবদুল মালিকের নির্দেশ শুনতে ও মানতে রাজী আছি।" অন্য যে উপায়েও বাই'আত দেয়া যেতে পারে।

তবে, কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্করাই বাই'আত দিতে পারবে। কারণ, অপ্রাপ্তবয়স্কদের বাই'আত গ্রহণযোগ্য নয়। আবু আকীল জাহ্‌রাহ ইবনে মা'বাদ তাঁর দাদা আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যিনি (ইবনে হিশাম) রাসূল (সাঃ) এর সময় জীবিত ছিলেন; তাঁর মা যয়নাব ইবনাতু হামিদ তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ্'র রাসূল! তাঁর কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করুন।' তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, **'সে তো ছোট'**। অতঃপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে হিশামের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন। (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৭২১০)

বাই'আতে উচ্চারিত শব্দ সমূহের ব্যাপারে কোন সীমাবদ্ধতা নেই; তবে খলীফা যে আল্লাহ্'র কিতাব এবং রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ্ দ্বারা শাসন করবেন এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি থাকা উচিত এবং যে ব্যক্তি বাই'আত দেবে সে যে সুসময়ে ও দুঃসময়ে এবং ভাল-মন্দ উভয় অবস্থাতেই খলীফার আনুগত্য করবে তাও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। উপরে উল্লেখিত বিষয়বস্তু অনুসারে বাই'আতে উচ্চারিত শব্দসমূহের ব্যাপারে পরবর্তীতে একটি আইন পাশ করা হবে।

কোন ব্যক্তি যখন খলীফাকে বাই'আত দেবে তখন প্রদত্ত বাই'আত উক্ত ব্যক্তির উপর আমানত হয়ে যাবে এবং সে চাইলেই এ বাই'আত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কারণ, খলীফা নিয়োগের ক্ষেত্রে বাই'আত প্রদান পর্যন্ত অন্যসব মুসলিমদের মতোই এটি তার অধিকার। কিন্তু, একবার বাই'আত প্রদান করলে সেখান থেকে হাত উঠিয়ে নেবার কোন অধিকার তার নেই। এমনকি সে চাইলেও তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে আল বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, একজন বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে ইসলামের ব্যাপারে বাই'আত দিল। কিন্তু তারপর সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। এরপর সে রাসূল (সাঃ) এর কাছে গিয়ে বলল,

"আমাকে বাই'আত থেকে মুক্ত করে দিন।' তিনি (সাঃ) তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর ঐ ব্যক্তি আবার আসল এবং একই দাবি করল কিন্তু রাসূল (সাঃ) আবারও তাকে প্রত্যাখান করলেন। তারপর সে ব্যক্তি শহর ছেড়ে চলে গেল। [এ পরিপ্রেক্ষিতে] রাসূল (সাঃ) বললেন, **"এই শহর হচ্ছে কামারের জ্বলন্ত চুল্লীর মতো; এটি অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে এবং সেইসাথে, শ্বাশত সুন্দর ও সত্যকে আলোকদ্যুতির মতো বিচ্ছুরিত করে।"** (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৭২০৯)

এছাড়া, আব্দুল্লাহ্ ইবন উমরের বরাত দিয়ে মুসলিম নাফিঈ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবন উমর (রা.)) রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন,

"যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত সরিয়ে নিল, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে আল্লাহ্'র সাথে দেখা করবে যে তার পক্ষে কোন প্রমাণ থাকবে না।" (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৫১)

বস্তুতঃ খলীফার বাই'আত থেকে হাত উঠিয়ে নেবার অর্থ হল আল্লাহ্'র আনুগত্য থেকে হাত সরিয়ে নেয়া। তবে, এটি শুধুমাত্র সে অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যখন খলীফাকে নিযুক্তির বাই'আত দেয়া হবে কিংবা মুসলিম উম্মাহ্ খলীফাকে পূর্ণ আনুগত্যের শপথ প্রদান করবে। তবে, কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে খলীফা হিসাবে মনোনীত করে বাই'আত দেয়, কিন্তু উক্ত মনোনীত ব্যক্তি যদি মুসলিম উম্মাহ্ কর্তৃক নিযুক্তির বাই'আত না পায়, তবে এক্ষেত্রে বাই'আত দানকারী ব্যক্তি তার প্রদত্ত বাই'আত থেকে হাত সরিয়ে নিতে পারবে। কারণ, সে মুসলিম উম্মাহ্ কর্তৃক নিযুক্তির বাই'আত প্রাপ্ত হয়নি। মূলতঃ উপরোক্ত হাদীসটি (চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত) খলীফার আনুগত্য থেকে হাত সরিয়ে নেবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে; এমন ব্যক্তির উপর থেকে নয় যিনি খলীফা হিসাবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হননি।

'যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত সরিয়ে নিল, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে আল্লাহ্'র সাথে দেখা করবে যে তার পক্ষে কোন প্রমাণ থাকবে না।' (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৫১)

খিলাফতের ঐক্য

হুকুম শারী'আহ্ অনুযায়ী মুসলিমরা একই রাষ্ট্রে বসবাস করতে এবং একজন শাসক দ্বারা শাসিত হতে বাধ্য। কারণ, মুসলিমদের জন্য একের বেশী রাষ্ট্র থাকা এবং একই সময়ে একাধিক খলীফা বর্তমান থাকা অবৈধ। এছাড়া, খিলাফত রাষ্ট্র হল একটি ঐক্যবদ্ধ শাসনব্যবস্থা। পশ্চিমাদের ফেডারেল ব্যবস্থা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়।

এটা এ কারণে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন আমি আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে,

"যে ব্যক্তি কোন ইমামকে বাই'য়াত প্রদান করল, সে যেন তাকে নিজ হাতের কর্তৃত্ব ও স্বীয় অন্তরের ফল (অর্থাৎ সবকিছু) দিয়ে দিল। এর পর তার উচিৎ উক্ত ইমামের আনুগত্য করা। যদি অন্য কেউ এসে (প্রথম নিযুক্ত) খলীফার সাথে (ক্ষমতার ব্যাপারে) বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে দ্বিতীয়জনের গর্দান উড়িয়ে দাও।" (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৪৪)

মুসলিম শরীফে আরও বর্ণিত আছে যে, আফরাজাহ্ বলেছেন: তিনি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন,

"যখন কারও অধীণে তোমাদের বিষয়সমূহের ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, এমতাবস্থায় যদি কেউ তোমাদের বিভক্ত করতে আসে তবে তাকে হত্যা কর।" (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৪৪)

এছাড়া, আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"যদি দুইজন জন্য খলীফার জন্য আনুগত্যের বাই'আত নেয়া হয়, তবে পরের জনকে হত্যা কর।" (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৫৩)

মুসলিম শরীফে আরও বর্ণিত আছে যে, আবু হাজিম বলেছেন যে, "আমি আবু হুরায়রার সাথে পাঁচ বছর অতিবাহিত করেছি এবং তাকে বলতে শুনেছি: রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"বনী ইসরাইলকে শাসন করতেন নবীগণ। যখন এক নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন তাঁর স্থলে অন্য নবী আসতেন, কিন্তু আমার পর আর কোনও নবী নেই। শীঘ্রই অনেক সংখ্যক খলীফা আসবেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন তখন আপনি আমাদের কি করতে আদেশ করেন? তিনি (সাঃ) বললেন, তোমরা একজনের পর একজনের বাই'আত পূর্ণ করবে, তাদের হক আদায় করবে। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের উপর (শাসকদের উপর) অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন।" (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৩৪৫৫)

প্রথম হাদীস অনুসারে, যদি ইমামত বা খিলাফত কারও উপর ন্যস্ত করা হয় তবে তার আনুগত্য করতে হবে। এমতাবস্থায় কেউ যদি খলীফার কর্তৃত্বের ব্যাপারে বিবাদ করতে আসে তবে তার সাথে যুদ্ধ করতে হবে। আর, সে যদি বিরত না হয় তবে তাকে হত্যা করতে হবে।

দ্বিতীয় হাদীস অনুসারে, মুসলিমরা যখন একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় থাকবে, এ অবস্থায় কেউ যদি তাদের ক্ষমতা ও ঐক্যে ফাটল

ধরাতে চায় তবে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। এ দুটি হাদীস খিলাফত রাষ্ট্রকে খন্ড খন্ড করার ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, রাষ্ট্রকে বিভক্ত করার বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী ঘোষণা করেছে এবং সেইসাথে, অস্ত্র বা শক্তি প্রয়োগ করে হলেও রাষ্ট্রকে খন্ড-বিখন্ড করার সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছে।

তৃতীয় হাদীসটি নির্দেশ করছে যে, কোন কারণে যদি খলীফার অনুপস্থিতি থাকে – সেটা খলীফার মৃত্যু কিংবা অপসারণ কিংবা পদত্যাগ যে কারণেই হোক না কেন এবং এ অবস্থায় যদি দুইজন খলীফার জন্য আনুগত্যের বাই'আত নেয়া হয় তবে দ্বিতীয়জনকে হত্যা করতে হবে। এর অর্থ হল, প্রথম যাকে বাই'আত দেয়া হবে তিনিই মুসলিমদের খলীফা হিসাবে বিবেচিত হবেন। অর্থাৎ, প্রথম ব্যক্তি ব্যতীত যত জনকেই বাই'আত দেয়া হোক না কেন তাদের প্রত্যেকের সাথে যুদ্ধ করতে হবে, যদি তারা খলীফার পদ থেকে সরে না দাঁড়ায়। এ হাদীসটি আমাদের পরিস্কারভাবে নির্দেশ দেয় যে, রাষ্ট্রকে খন্ড-বিখন্ড করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং যে কোন মূল্যে খিলাফত রাষ্ট্রের অখন্ডতা বজায় রাখা মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য।

চতুর্থ হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, রাসূল (সাঃ) এর পর বহু সংখ্যক খলীফা আসবেন। সাহাবাগণ (রা.) যখন রাসূল (সাঃ) কে এইসব খলীফাদের ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন রাসূল (সাঃ) বললেন যে, সাহাবাদেরকে একজনের পর একজনের প্রতি আনুগত্যের বাই'আত সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিয়োগকৃত প্রথমজনকে বৈধ খলীফা হিসেবে মেনে নিতে হবে। প্রথমজনের পরে যে বা যারা খলীফা হিসেবে বাই'আত গ্রহণ করবে, সেই বাই'আত বাতিল ও অবৈধ বলে পরিগণিত হবে। কারণ, একজন খলীফা বর্তমান থাকা অবস্থায় অন্য কাউকে বাই'আত প্রদান করা নিষিদ্ধ। এই হাদীস আরও নির্দেশ করে যে, মুসলিমদের জন্য সর্বাবস্থায় একজন মাত্র খলীফার আনুগত্য বাধ্যতামূলক। সুতরাং, মুসলিমদের একের অধিক খলীফা থাকা এবং একাধিক রাষ্ট্র থাকা শারী'আহ্ অনুমোদিত নয়।

(চলবে...)

...২৭ পৃষ্ঠার পর থেকে

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা...

ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণ করে দেয়ার ক্ষমতা দিয়ে তারা এটি করে থাকে। সরকার পরিচালিত কিছু গণ প্রকল্পকেও তারা এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে থাকে। এসব হস্তক্ষেপ তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (অর্থনৈতিক স্বাধীনতা) সাথে সাংঘর্ষিক এবং এগুলো কেবলমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। অনেক (রক্ষণশীল) পুঁজিবাদী এ হস্তক্ষেপ নীতি গ্রহণ করে না এবং তারা একে প্রশ্নবিদ্ধ করে ও প্রচার করে যে, সরকারি কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে দামের কলাকৌশলই কেবল উৎপাদক ও ভোক্তার স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে যথেষ্ট। হস্তক্ষেপের সমর্থকরা (উদারপন্থীরা) ধরনের জোড়াতালি দেয়া সমাধানের ব্যাপারে সুপারিশ করেছে যা বিশেষ পরিস্থিতিতে ও অবস্থাতে প্রয়োগ করা হয়। এমনকি এসব পরিস্থিতিতেও প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সম্পদের বন্টন প্রত্যেকের সব মৌলিক চাহিদাকে পরিপূর্ণভাবে পূরণ করতে পারে না।

মালিকানার স্বাধীনতার ধারণা এবং দামকে সম্পদ বন্টনের একমাত্র কলাকৌশল হিসেবে বিবেচনা করার ধারণার কারণে পণ্য ও সেবার খারাপ বন্টন হয় এবং এ চিত্র পুঁজিবাদ প্রয়োগ হয় এমন সব সমাজে আধিপত্য বিস্তার করে। আমেরিকান সমাজের ক্ষেত্রে অনেক আমেরিকানদের তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও এমনকি বিলাস সামগ্রী অর্জনের জন্য দেশের সম্পদে যথেষ্ট শেয়ার রয়েছে। এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সে দেশের ব্যাপক সম্পদের কারণে, যা সেদেশের প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ও বিলাসী সামগ্রী অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে। তবে এটি একজন ব্যক্তি উৎপাদনে যতটুকু শ্রম দিতে পারছে তার মূল্যের সমপরিমাণ শেয়ারের কারণে হচ্ছে এরূপ বলা যাবে না। তাছাড়া দামের কৌশলকে বন্টনের নিয়ন্ত্রক হিসেবে নির্ধারণের কারণে পশ্চিমা পুঁজিপতি একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা অন্য দেশের নতুন বাজার খুঁজতে প্রণোদিত হয়, যেখান থেকে তারা কাঁচামাল সংগ্রহ করে ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করে। উপনিবেশবাদ, আঞ্চলিক কর্তৃত্ব, অর্থনৈতিক দখলদারিত্ব থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলো একচেটিয়া ব্যবসা ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে দামকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এ ভিত্তিতেই পৃথিবীর সম্পদ পুঁজিপতি একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে পুঞ্জীভূত হয়েছে। পুঁজিবাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এসব ভুল নিয়ম-নীতির কারণে তা সম্ভব হয়েছে।

(চলবে...)

...২৪ পৃষ্ঠার পর থেকে

চীনকে মোকাবিলার জন্য ভারতের নীতিতে...

সুতরাং, চীন ভারতের তুলনায় ক্ষমতার মাপকাঠিতে অনেকখানিই এগিয়ে রয়েছে ...

৯. পরিশেষে, পাকিস্তানের সাথে ভারতের পশ্চিম সীমানা সুরক্ষিত করে দেয়ার পরে চীনের সাথে বিরোধপূর্ণ উত্তর ফ্রন্টে যুদ্ধ করার জন্য ভারতকে ঠেলে দিতে আমেরিকা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, পাকিস্তানের আমেরিকাপন্থী শাসকেরা বিজেপির আমলে ভারতকে অনেক সুবিধা প্রদান করেছিল, কারণ বিজেপিও আমেরিকাপন্থী একটি দল। যখন কংগ্রেস পার্টি ক্ষমতায় ফিরে আসে তখন এই উদ্যোগে ভাটা পড়ে এবং ভারতের চীনকে মোকাবিলা করার ভীতি ও সাম্প্রতিক সময়ের চীনের হুমকির প্রেক্ষিতে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও কারণ হচ্ছে যে, এই পার্টি বৃটেনের প্রতি অনুগত এবং বৃটেন কংগ্রেসকে আমেরিকার পরিকল্পনা অনুসরণ করতে নিরুৎসাহিত করে। আমেরিকা ভারতকে পূর্ব দিকে বিশেষ করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দক্ষিণ চীন সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হতে চাপ প্রয়োগ করে এবং সেখানকার তেল-গ্যাস জ্বালানী সম্পদের ভাগ নেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ভিয়েতনামের সাথে একজোট হয়ে কাজ করার ব্যাপারে রাজি করায় এবং ভিয়েতনামেরও সেই সম্পদের উপর দাবি রয়েছে ও স্প্র্যাটলি দ্বীপ নিয়েও চীনের সাথে তার বিরোধ চলছে... আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়াকেও অনেকগুলো দেশের সমন্বয়ে জোট গড়ে তোলার মাধ্যমে চীনকে মোকাবিলার নিমিত্তে এই অঞ্চলের দিকে ধাবিত করছে... আমেরিকা জাপানকে তার প্রতিরক্ষার বিষয়ে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে যাতে করে তার বোঝা লাঘব হয়। যদি নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করে এবং আবার ক্ষমতায় পৌছায় তাহলে পূর্বে দক্ষিণ চীন সাগরে আমেরিকার সাথে ভারতের কার্যক্রম আরও বেগবান হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। চীন-ভারতের তুলনার ক্ষেত্রে: চীন শক্তির তুলনায় ভারতের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে... এবং চীনের উদ্দেশ্য যদি শুধুমাত্র নিজের এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে এবং কেবলমাত্র নিজস্ব অঞ্চলে আমেরিকার গতিবিধির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমেরিকাকে মোকাবেলা করার চিন্তায় সীমাবদ্ধ না থাকে..., এবং চীন যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুঁজিবাদকে আদর্শ হিসেবে মেনে নিতে শুরু না করে, বিশেষ করে অর্থনীতিতে... তাহলে সে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি জোড়ালো ভূমিকা রাখার ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হতে পারে এবং এটা আমেরিকার স্বার্থের উপর খুব শক্তিশালী আঘাত হবে।

প্রশ্নোত্তরঃ

কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ

প্রশ্নঃ

মুসলিমদের কুফর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা যে নিষিদ্ধ তা নিয়ে গবেষণা করতে গেলে, কেউ একজন আমাকে বলল, তিনি কোন একজন আলেমের কাছে শুনেছেন যে, ইউসুফ (আ.) মিশরের শাসকের অধীন শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেছেন; তাঁর উদাহরণ দিয়ে তিনি একে বৈধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতঃপর, আবিসিনিয়ার শাসকের নাজ্জাশী একজন মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও কুফর ব্যবস্থায় শাসন করেছেন এবং রাসূল (সাঃ) তার জন্য জানাজা পড়েন। অন্যদিকে মাসলাহাও (উম্মাহ্'র স্বার্থ) একটি শারী'আহ্ দলীল, যা এ অংশগ্রহণকে অনুমোদন দেয়। একজন মুসলিম, শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করলে তিনি একজন সেক্যুলার ব্যক্তির চেয়ে মুসলিমদের স্বার্থ বেশি নিশ্চিত করতে পারেন।

প্রশ্ন হলো এই দলিলগুলো কতটা যুক্তিযুক্ত? এটা কি সত্য যে এমন আলেমও আছেন যিনি এটাকে সমর্থন করেন? দয়া করে এর উত্তর দেবেন। আল্লাহ্ আপনাকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করুন।

উত্তরঃ

হ্যাঁ, সরকারপন্থী অনেক আলেম এ ধারণার পক্ষে। তারা দলিলের ওপর ভিত্তি করে কথা বলেননা। কেননা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার মাধ্যমে শাসনের পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা শাসন করা বাধ্যতামূলক। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে শাসন করুন এবং যে সত্য আপনার কাছে এসেছে তা বাদ দিয়ে তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করবেন না।" [সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৮]

এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে শাসন করুন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা থেকে যেন আপনাকে তারা প্রলুব্ধ করতে না পারে।" [সূরা আল মায়িদাহ্ : ৪৯]

এ রকম একই অর্থ বহন করে এমন অনেক দলিল রয়েছে।

আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা কুফর, যদি শাসক এসবে বিশ্বাস করে। এটা জুলুম বা ফিসক (সীমালঙ্ঘন) শাসক যদি এতে বিশ্বাস না করে।

আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বক্তব্যে এটা স্পষ্ট,

"এবং যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারাই কাফির।" [সূরা আল মায়িদাহ্ : ৪৮]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"এবং যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারাই যালিম।" [সূরা আল মায়িদাহ্ : ৪৫]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"এবং যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারাই ফাসেক।" [সূরা আল মায়িদাহ্ : ৪৭]

সরকারপন্থী ওলামারা তাদের প্রমাণ হিসেবে যা তুলে ধরেন তার কোন ভিত্তি নেই। আমাদের বক্তব্যের প্রমাণ হলো :

১. ইউসুফ (আ.) এর কর্মকে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করে যুক্তি দেয়া হয় যে তিনি মিশরের রাজার আইন অনুযায়ী শাসন করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে। কোন প্রেক্ষাপট ছাড়াই এই যুক্তির অবতারণা। কারণ আমরা রাসূল (সাঃ) কর্তৃক আনীত ও আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত ইসলাম অনুসরণ করার জন্য আদিষ্ট। আমাদেরকে ইউসুফ (আ.) বা অন্য কোন নবীর শারী'আহ্ অনুসরণ করতে বলা হয়নি। কারণ আমাদের পূর্বের লোকদের আইন আমাদের জন্য নয়। ইসলাম এগুলোকে মানসূখ (রহিত) করে দিয়েছে। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"আমি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি (হে মুহাম্মদ) এর পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের সমর্থক ও অন্যগুলির ওপর মাপকাঠি। সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দিয়ে শাসন করুন এবং যে সত্য আপনার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট শারী'আহ্ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি।" [সূরা আল মায়িদাহ্ : ৪৮]

'অন্যগুলির ওপর মাপকাঠি' মানে, এটি অন্যসব কিতাবকে মানসূখ করে দিয়েছে। ইসলাম পূর্বের সকল কিতাবকে মানসূখ করে দিয়েছে তাই পূর্বের লোকদের আইন আমাদের জন্য আইন নয়। উসূলবিদদের অনেক আলেম আছেন যারা এই নীতিকে অন্যভাবে গ্রহণ করেছেন,

"আমাদের পূর্বের লোকদের আইন আমাদের জন্য আইন হিসেবে থাকবে যতক্ষণ না তা মানসূখ হয়ে যায়।"

এই নীতি, পূর্বের নবীদের আইনকে দলিল হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম কর্তৃক মানসূখ হয়ে যায়নি এমন বিষয়সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে। যে সকল বিষয় ইসলাম কর্তৃক মানসূখ হয়ে গিয়েছে সেসব পূর্বের আইন গ্রহণ নিষিদ্ধ। আমাদের শারী'আহ্ অনুযায়ী আমাদেরকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে শাসন করা ইসলামের সুস্পষ্ট হুকুম। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এমন পূর্বের সকল আইন রহিত। উসূলের সকল আলেম, হোক তারা প্রথম নীতি "আমাদের পূর্বের লোকদের আইন আমাদের আইন নয়" অথবা দ্বিতীয় নীতি "আমাদের

পূর্বের লোকদের আইন আমাদের জন্য আইন হিসেবে থাকবে যতক্ষণ না তা মানসূখ হয়ে যায়" গ্রহন করুক, তারা সকলেই আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে শাসন করা বাধ্যতামূলক হিসেবেই দেখেন। কেননা এগুলো ইসলামে সুস্পষ্টভাবেই রয়েছে যার বক্তব্য সুস্পষ্ট ও প্রমাণ অকাট্য। ইসলাম পূর্বের আইনসমূহ রহিত করে যদি তা শারী'আহ্ দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

ইউসুফ (আ.) কিছু বিষয়ে মিশরের শাসনকর্তার আইন অনুযায়ী শাসন করেছেন সরকারপন্থী ওলামাদের এই অনুমান মেনে নিয়েই আমরা পূর্বের কথাগুলো বলেছি। তবে প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন নবী এবং নিষ্পাপ, সুতরাং তিনি আল্লাহ্ যা তাঁর প্রতি নাযিল করেছেন তা দিয়েই শাসন করেছেন। যেমনি আল্লাহ্ জেলের মধ্যে তাঁর (আ.) দু' সহচরের সাথে কথোপকথোন বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো আইন গ্রহণযোগ্য নয়।

"হে কারা সংগীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতকগুলি নামের ইবাদত করছ, যেই নামগুলি তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ, এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠাননি। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্র'ই। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারো ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত, ইহাই শ্বাশত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নয়।" [সূরা ইউসুফ : ৩৯-৪০]

স্পষ্টতঃ ইউসুফ (আ.) বললেন, **"বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্'রই।"** এজন্য শাসন কেবল বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ্'রই জন্য যাকে মুসলিমরা ইবাদত করে এবং যার শারী'আহ্ গ্রহণ করেছে এবং যার সাথে অন্য কারো শরীক করেনা।

...সরকারপন্থী অনেক আলেম এ ধারণার পক্ষে। তারা দলিলের ওপর ভিত্তি করে কথা বলেননা। কেননা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার মাধ্যমে শাসনের পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা শাসন করা বাধ্যতামূলক...

ইউসুফ (আ.) এর কর্ম তাঁর কথার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, এর কোন মানে নেই যে তিনি বলবেন আল্লাহ্ ছাড়া কোন বিধান দাতা নেই এবং নিজে কুফর শাসনে পরিচালিত হবেন। এই যুক্তি হলো আল্লাহ'র অন্যতম নবীর নিষ্পাপতার প্রতি এক ধরণের আক্রমণ এবং আল্লাহ্'র অবমাননা করা; যা একটি ভয়াবহ বিষয়। এথেকে বলা যায়, ইউসুফ (আ.) কুফর দ্বারা শাসন করেননি, আল্লাহ্ তার প্রতি যা নাযিল করেছেন, তিনি তা দ্বারা শাসন করেছেন, তিনি আল্লাহ্'র কাছে সত্যবাদী এবং নিষ্ঠাবান।

তারপরও আমরা যদি আলোচনার স্বার্থে ধরেও নেই যে, আল্লাহ্ ইউসুফ (আ.) কে তাঁর শারী'আহ্'তে মিশরের শাসকের কিছু বিধান প্রয়োগ করার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন, এক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইসলাম পূর্বের আইন বাতিল করে দিয়েছে, রাসূল (সাঃ) এর বার্তা পাবার পর অর্থাৎ ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন করোনা, আমাদের জন্য শুধু রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত ইসলাম বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, অন্য কিছু নয়।

২. নাজ্জাশীর ঘটনা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারও প্রেক্ষাপটের বাইরে। কেউ যদি এ বিষয়ে সঠিকভাবে গবেষণা করে তাহলে দেখতে পাবে নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাজা ছিলেন। তিনি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন ও অল্প কিছুদিন পরেই মারা যান। তিনি ইসলাম বাস্তবায়নের সুযোগ পাননি এবং তার ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ্যে ঘোষণা দেবার সাহস পাননি কেননা তার জনগণ ছিল কাফির। এই ঘটনা এমন কোন মুসলিমের ক্ষেত্রে করা প্রয়োগ যায়না যেখানে সে সকলের কাছে মুসলিম বলে পরিচিত। বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে তুল ধরা হলো:

ক. আবিসিনিয়ার শাসকের নাম নাজ্জাশী নয়, আবিসিনিয়ার শাসকদের উপাধি নাজ্জাশী ছিল। তাকে নাজ্জাশী বলা হতো যেমনি পারস্যের শাসকদের কিসরা এবং রোমানদের বলা হতো কায়সার। যে নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করে ও রাসূল (সাঃ) যার জন্যে দো'আ করেন তার ইসলাম গ্রহণের সময়কাল খুব বেশি দিন ছিলনা, যেমনি উল্লেখিত প্রশ্নে অনুমান করা হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করার পর তার বেঁচে থাকার সময়কাল ছিল খুবই কম – দিন কয়েক বা এক দু' মাস। তিনি সেই নাজ্জাশী নন যার কাছে মুসলিমরা মক্কা থেকে হিযরত করে গিয়েছিল, তিনি সেই নাজ্জাশীও নন যার কাছে রাসূল (সাঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আমর বিন উমাইয়া আয-যামিরিকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অন্য এক নাজ্জাশী, যার কাছে রাসূল (সাঃ) দূত পাঠিয়েছিলেন, তার পরে এই নাজ্জাশী ক্ষমতায় এসেছিলেন।

এই বিষয়ে বর্ণনা বুখারী ও মুসলিম শরিফে পাওয়া যায়। যারা মনে করেন মক্কা থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করে নাজ্জাশীর দরবারে গিয়েছিল, তিনি সেই নাজ্জাশী যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা ভুল করছেন। অথবা যারা মনে করেন রাসূল (সাঃ) যার কাছে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনি সেই নাজ্জাশী, তারাও ভুল করছেন কেননা এগুলো বুখারী ও মুসলিম শরিফের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক। তার প্রমাণ হলো :

মুসলিম বর্ণনা করেন কাতাদা থেকে, যিনি বর্ণনা করেন আনাস (রা.) থেকে, **"রাসূল (সাঃ) কায়সার, কিসরা, নাজ্জাশী এবং সকল অত্যাচারী শাসকের কাছে চিঠি লিখেছিলেন আল্লাহ্'র আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য। এবং সেই নাজ্জাশী নয়, যার জন্য রাসূল (সাঃ) দোয়া করেছিলেন।"**

তিরমিযি বর্ণনা করেন কাতাদা থেকে, যিনি বর্ণনা করেন আনাস (রা.) থেকে, **"রাসূল (সাঃ) তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে কিসরা, কায়সার, নাজ্জাশী এবং সকল অত্যাচারী শাসককে আল্লাহ্'র আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। এবং সেই নাজ্জাশী নয়, যার জন্য তিনি দোয়া করেছিলেন।"**

মুসলিম ও তিরমিযির হাদিস থেকে স্পষ্ট রাসূল (সাঃ) যে নাজ্জাশীর জন্য দো'আ করেছিলেন ও যার কাছে চিঠি লিখে দূত পাঠিয়েছিলেন এরা এক নাজ্জাশী নয়।

খ. রাসূল (সাঃ) হুদাইবিয়াহ থেকে ফিরে এসে শাসকদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন যা ছিল হিযরতের ৬ষ্ঠ বছরের জিলক্বদের পরে। যে নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সে নাজ্জাশীর কাছে তিনি (সাঃ) চিঠি পাঠাননি। তিনি সেই নাজ্জাশী যিনি হিযরতের ৭ম বছরের দিকে ক্ষমতায় এসেছিলেন।

গ. আবু হুরায়রা (রা.) রাসূল (সাঃ) এর সাথে ছিলেন যখন তিনি নাজ্জাশীর জন্য দো'আ করছিলেন, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, হাদিসের বর্ণনা মোতাবেক। আবু হুরাইরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং দাওস থেকে ৭০-৮০ জনের প্রতিনিধি নিয়ে মদীনায় এসছিলেন যখন

রাসূল (সাঃ) খাইবারে ছিলেন। তাই তিনি সেখানে গিয়ে তাঁর (সাঃ) সাথে দেখা করলেন। রাসূল (সাঃ) খাইবারের গণিমতের মালের কিছু অংশ তাদের দিলেন। খাইবারের যুদ্ধ হিজরী ৭ম সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার মানে নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করেন ও শাসক হন হিজরী ৭ম সালের মধ্যেই এবং সে বছরই মারা যান। তিনি বেশি দিন বেঁচে থাকেননি।

ঘ. আবিসিনিয়া ছিল কুফর খৃষ্টানদের আবাসভূমি। তাদের শাসক ইসলাম গ্রহণ করেছিল সকলের অজান্তে, এমনকি নবী (সাঃ) এর অজান্তে, তিনি নাজ্জাশীর মৃত্যুর খবর ওহীর মাধ্যমে জেনেছিলেন। তার জন্য দোয়া করার বিষয়ে যে হাদিস এসেছে তা এর দলিল।

বুখারী আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণনা করেন, **"আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) নাজ্জাশীর মৃত্যুর খবর ঐদিনই সাথে সাথে জানিয়ে দিলেন। তিনি (সাঃ) মুসাল্লায় (নামাজের জায়গা) গেলেন এবং সকলে তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি ৪ তাকবির পাঠ করলেন (জানাজার নামাজ)।"**

অন্য বর্ণনায়: **"আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) নাজ্জাশীর মৃত্যুর পর ঐদিনই আমাদের জানালেন। তিনি বললেন: তোমাদের ভাইয়ের গুণাহ্ মাফের জন্য দো'আ কর।"**

বুখারী জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, **"আজ এক সৎকর্মশীল লোক মারা গেছে, তাই তার জন্য দোয়ার উদ্দেশ্যে জড়ো হও।"** তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সাঃ) এর পেছনে লাইনে দাঁড়ালাম এবং জানাজা পড়লাম; জাবির থেকে আবু আয-যুবাইর বলেন, "আমি ছিলাম দ্বিতীয় সারিতে।" জাবির এর অন্য এক বর্ণনায়, যখন নাজ্জাশী মারা গেল তখন রাসূল (সাঃ) বলেন, **"আজ এক সৎ লোক মারা গেছে, তাই আসামার (নাজ্জাশীর নাম) জন্যে জড়ো হও ।"**

"আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) নাজ্জাশীর মৃত্যুর খবর ঐদিনই সাথে সাথে জানিয়ে দিলেন।" "আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) নাজ্জাশীর মৃত্যুর পর ঐদিনই আমাদের জানালেন। তিনি বললেন: **"তোমাদের ভাইয়ের গুণাহ্ মাফের জন্য দোয়া কর।" "আজ এক সৎকর্মশীল লোক মারা গেছে, তাই তার জন্য দোয়ার উদ্দেশ্যে জড়ো হও।"** অর্থাৎ নাজ্জাশী যেদিন মারা গেলেন, তার মৃত্যুর ঘোষণা হল কিন্তু তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ায় এবং রাসূল (সাঃ) ছিলেন মদিনায়, যার মানে তিনি ওহীর মাধ্যমে জানলেন। এবং রাসূল (সাঃ) এর বক্তব্য: **"তোমার ভাইয়ের গুণাহ্ মাফের জন্য দোয়া কর" "আজ এক সৎকর্মশীল লোক মারা গেছে"** এর মানে তাদের কাছে নাজ্জাশীর মৃত্যু ও ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে সংবাদ জানা ছিলনা। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাধারণত যখন কোন সাহাবী (রা.) মারা যেতেন তখন তাদের জানাযার নামাজের জন্য এভাবে আহ্বান করতেন না।

ঙ. এজন্য নাজ্জাশীর ঘটনা এই বাস্তবতার সাথে মিল নেই। নাজ্জাশী গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তার জনগণ ছিল কাফির, তিনি কিছুদিনের মধ্যেই মারা গিয়েছিলেন, ওহী ছাড়া কেউ তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানত না। এই ঘটনা, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে একজন মুসলিমের কুফর শাসনে অংশগ্রহণের সাথে মিল নেই। যারা একে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে থাকেন, তাদের কোন প্রমাণ নেই, এমনকি কোন সন্দেহযুক্ত প্রমাণও।

৩. মাসলাহাকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার প্রেক্ষাপটের বাইরে, আমরা যেভাবে বিষয়টি দেখি – কিছু উসূলের আলেম যারা মাসলাহাকে (উম্মাহ্'র স্বার্থ) প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন, তারা এর সাথে এক শর্ত যুক্ত করেন তা হলো, মাসলাহা গ্রহণ করা যাবে যদি শারী'আহ্ এ ব্যাপারে আদেশ বা নিষেধ না করে থাকে। যদি এ ব্যাপারে শারী'আহ্'র আদেশ অথবা নিষেধ বিদ্যমান থাকে তাহলে মাসলাহার নিয়ম কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। সেক্ষেত্রে শারী'আহ্'তে উল্লেখিত বিধানই গ্রহণযোগ্য। উসূলের কোন বিখ্যাত আলেমই আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত আয়াত বা বিধান রহিত করে উম্মাহ্'র স্বার্থ গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তি দেননি।

সুদ হারাম, যা শারী'আহ্'র দলিল দ্বারা প্রমাণিত। উম্মাহ্'র স্বার্থের কারণে যদি সুদ দরকার হয়, এটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কেননা শারী'আ'হ্ একে হারাম ও পরিত্যাগ করেছে। এমনকি যদি কোন তথাকথিত আলেম সুদ গ্রহণযোগ্য বলে ফাতওয়া দেয়, তাদের ফাতওয়া অগ্রহণযোগ্য কেননা এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক।

আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ, ঠিক হারাম হওয়া সুদের মতই, কেননা এটা ওহীর মাধ্যমে এসেছে। সুতরাং এখানে উম্মাহ্'র স্বার্থের কোন স্থান নেই বরং শারী'আহ্ যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে তা-ই উম্মাহ্'র জন্য স্বার্থ, এর উল্টোটা নয়।

এমনকি উসূলের আলেমরা যারা ভুলবশত মাসালিহ মুরসালাকে গ্রহণ করেছেন, তাদের মাযহাবে একে কোথাও উৎস হিসেবে পেশ করেননি। বাস্তবে মাসালিহ মুরসালা বলতে কিছু নেই। কেউ কেউ বলে থাকেন শারী'আহ্ কিছু বিষয়ের আইন দেয়নি এবং এসব ক্ষেত্রেই তারা মাসলাহা ব্যবহার করে থাকেন। বাস্তবে ইসলাম কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করা ছাড়া ছেড়ে দেয়নি, সব বিষয়ের ওপরই ইসলামের নিয়ম রয়েছে:

"এবং আমি এই কিতাব সকল কিছুর ব্যাখ্যা হিসেবেই পাঠিয়েছি।" [সূরা আন-নাহল : ৮৯]

"আমরা এ কিতাবে কোন কিছুই উপেক্ষা করিনি।" [সূরা আল-আনআম : ৩৮]

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনিত করলাম।" [সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৩]

৪. উপসংহারে বলা যায়, কুফর ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ এবং আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা কুফর যদি শাসক এসব কুফর বিধানে বিশ্বাস করে। শাসক যদি কুফর বিধানে বিশ্বাস না করে তা দিয়ে শাসন করে তাহলে তা হবে অন্যায়-অবিচার ও সীমালঙ্ঘন।

"এবং যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারাই কাফির।" [সূরা আল মায়িদাহ্ : ৪৮]

"এবং যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারাই জালিম।" [সূরা আল মায়িদাহ্ : ৪৫]

"এবং যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারাই ফাসেক।" [সূরা আল মায়িদাহ্ : ৪৭]

যারা বলে যে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য শাসনব্যবস্থায় মুসলিমদের অংশগ্রহণ বৈধ তাদের কোন দলীল নেই। এমনকি কোন সন্দেহযুক্ত দলিলও। কেননা যে দলিল এ বিষয়টিকে নিষিদ্ধ করে তা প্রমাণ ও বক্তব্যের দিকে থেকে সন্দেহাতীত।

আশাকরি এই উত্তর সম্পূর্ণ, পরিষ্কার এবং আল্লাহ্'র ইচ্ছায় সন্তোষজনক।

৪ রজব ১৪৩৫ হিজরী
৩ মে, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ

প্রশ্নোত্তরঃ

চীনকে মোকাবিলার জন্য ভারতের নীতিতে আমেরিকার প্রভাব

প্রশ্নঃ

০৭/০৪/২০১৪ তারিখে ভারতে সাধারণ নির্বাচন শুরু হয়েছে যা ১২/০৫/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত চলবে এবং এর ফলাফল ১৬/০৫/২০১৪ তারিখে ঘোষণা করা হবে। এই নির্বাচনে দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক জোট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যার একটি হচ্ছে আমেরিকাপন্থী ভারতীয় জনতা পার্টি ও তার সাথে শরীক দলসমূহ এবং অপরটি হচ্ছে বৃটেনপন্থী কংগ্রেস পার্টি, যেটা ২০০৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বৃটেনের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে ও চীনকে মোকাবিলার ভীতির কারণে আমেরিকার সাথে নিষ্ক্রিয় সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে... প্রশ্ন হচ্ছে যে, চীনকে মোকাবিলার জন্য ভারতের নীতিতে আমেরিকার কি ধরণের প্রভাব থাকবে? এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল নিয়ে আমেরিকার পরিকল্পনার সাথে এর সম্পর্ক কি এবং এই দ্বন্দ্বের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ও জাপানকে অন্তর্ভূক্ত করার কি উদ্দেশ্য রয়েছে? এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কি বিজেপি কিংবা কংগ্রেস পার্টির বিজয় দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? ভারতের কি চীনকে মোকাবিলার সামর্থ্য রয়েছে? চীন এবং ভারতের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য কেমন?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিষ্কার হবে:

১. চীনকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র সুনির্দিষ্টভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আওতাধীন পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সাগরের তীরবর্তী দেশগুলোর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলের দেশগুলোর সাথে বিভিন্ন ধরণের জোট ও অংশীদারিত্বমূলক মৈত্রি বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সম্পর্ক জোড়দার করে চলেছে। এক দশকেরও অধিক সময় পূর্বে আমেরিকা এটা গুরুত্ব সহকারে শুরু করেছিল, কারণ সে অনুধাবন করতে পেরেছিল যে চীনকে নিয়ন্ত্রণের নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে যাচ্ছে কিংবা স্থবিরতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এর অর্থ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র চীনের উপর পূর্বাপেক্ষা অধিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারছে না। এটা আরো প্রকট হয় যখন দেখা যায় যে আমেরিকা চীনকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (WTO) যোগদানের আমন্ত্রণ জানায়, বাণিজ্যিক সম্পর্কের সম্প্রসারণ ঘটায় এবং যুক্তরাষ্ট্র-চীন দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত সংলাপকে আর পূর্বের মতো স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে না...। যাহোক, চীন আমেরিকার কক্ষপথে আবর্তিত হতে রাজি হয়নি, এমনকি তার নীতির সাথে একমত হতেও সম্মত হয়নি এবং পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সাগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের উপর চীনের আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্খাকেও আমেরিকা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। চীন একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে নিজের অখন্ডতা, ঐক্য ও স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং সামরিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য কিছু অঞ্চলে শুধুমাত্র আর্থিক লাভের জন্য নয় বরং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মানসে নিজের অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে শুরু করেছে এবং এই অঞ্চলে তার অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে যা আমেরিকার নীতির সাথে সাংঘর্ষিক কিংবা আমেরিকার প্রভাবকে হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। চীন এই অঞ্চলের উপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চায় এবং এটাকে সে তার নিয়তি মনে করে। চীন নিজের ভৌগলিক সীমারেখার অন্তর্গত অঞ্চলের উপর আধিপত্যকে পর্যাপ্ত মনে করে না এবং সে মনে করে যে কেবল এটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে বৃহৎ একটি রাষ্ট্রের পরিচিতি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে... আমেরিকা চীনের সামুদ্রিক এলাকাকে নিজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং এই আধিপত্যবাদী মনোভাবের কারণেই আমেরিকা নিজের আঞ্চলিক সীমানায় কর্তৃত্ব স্থাপন করে তৃপ্ত নয় বরং সমগ্র বিশ্বকেই সে তার নিজের এলাকা মনে করে। এজন্যই আমেরিকা আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের নিমিত্তে চীনের এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়... তাই আমেরিকা বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন ও কৌশলগত সংলাপের মাধ্যমে চীনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু এগুলোর কোনটিই চীনকে আমেরিকার কক্ষপথে আবর্তিত করাতে সক্ষম হয়নি; এমনকি জোটের অংশীদারও করতে পারেনি, বরং চীনের আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের নীতি আমেরিকাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে; ফলশ্রুতিতে এককভাবে চীনকে নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা আর কার্যকর হচ্ছে না এবং আমেরিকা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে শুরু করেছে। এজন্যই তার নৌবাহিনীর প্রায় ষাট ভাগ এই অঞ্চলে মোতায়েনের প্রয়োজন হয়েছে। চীনকে বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলার নীতির পাশাপাশি আমেরিকা তার আঞ্চলিক সমস্যাগুলোর মধ্যেও নাক গলানো শুরু করেছে... চীনকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য আমেরিকা এই অঞ্চলের দেশগুলোকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই দেশগুলোর মধ্যে তিনটি দেশ এই বেষ্টনিকে কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, দেশগুলো হচ্ছে: ভারত, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া...।

২. **ভারতের ক্ষেত্রে:** চীনের সাথে এই দেশটির প্রায় ৩৪৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে এবং এদের মধ্যে সীমানা সম্পর্কিত সমস্যা অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে। শতাব্দীর সিকিভাগ সময় ধরে তাদের মধ্যে অনেকবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষটি ছিল চতুর্দশতম দ্বি-পাক্ষিক সীমানা নির্ধারণী বৈঠক। অতঃপর তারা বৈঠক স্থগিত করে এবং পঞ্চদশতম বৈঠকটি ১৫-০৪-২০১৩ তারিখের ঘটনার জন্য আর অনুষ্ঠিত হয়নি। উক্ত তারিখে চীনের সামরিক বাহিনী ভারতের সীমানা অতিক্রম করে এবং লাদাখ অঞ্চলের ভারতীয় সীমানায় প্রবেশ করে তাঁবু গেড়ে অবস্থান গ্রহণ করে, কিন্তু তিন সপ্তাহ পরে ঐ এলাকা ছেড়ে চলে আসে। এটা ছিল একটা ক্ষমতার প্রদর্শণী, যার মাধ্যমে চীন ভারতের কাছে একটি বার্তা পৌঁছাতে চেয়েছিল; বার্তাটি হচ্ছে যে, চীন ১৯৬২ সালের অক্টোবরের মত পুনরায় সীমানা অতিক্রম করতে ও যুদ্ধ শুরু করতে প্রস্তুত রয়েছে। সেই সময়ে চীনের সামরিক বাহিনী অরুণাচল প্রদেশ আক্রমণ করে সেখান থেকে ভারতীয় সেনাদের বিতাড়িত করেছিল। ঐ হামলার এক মাস পরে চীন দ্বিতীয় বারের মতো ভারত আক্রমণ করে এবং প্রায় ২০০০ ভারতীয়কে হত্যা করে। এই ঘটনাটি অমীমাংসিতই থেকে যায় এবং তখন "প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা"

প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা হচ্ছে দুই দেশের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ব্যাপকভাবে আলোচিত স্থায়ী একটি সমস্যা। ১৯৫০ সালে চীন কর্তৃক দখলকৃত তিব্বত অঞ্চল নিয়ে সমস্যা হতে সৃষ্ট উত্তেজনার পাশাপাশি এটি তাদের মধ্যকার বৈরিতাকে আরো বৃদ্ধি করেছে। তাই এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারত এই অঞ্চলের বৌদ্ধদেরকে এবং তাদের নেতা দালাইলামাকে স্বাগত জানানোর মাধ্যমে আমেরিকাকে সহযোগিতা করেছে ও নির্বাসিত সরকার হিসেবে দালাইলামার জন্য কেন্দ্রীয় তিব্বত প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। এ সকল কারণে ভারত ও চীনের মধ্যে চলমান উত্তেজনা প্রশমনের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ...।

৩. চীনকে মোকাবিলা করতে ভারতকে রাজি করানোর জন্য আমেরিকা চীন ও ভারতের মধ্যে চলমান উত্তেজনাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, কিংবা ভারতকে উস্কে দিতে তাদের মধ্যকার সমস্যাগুলোকে খোঁচা দিয়ে আরও প্রকট করে তুলেছিল। এসবের পরও ভারত স্থলপথে চীনকে মোকাবিলা করতে ভয় পায় এবং চীনের আগ্রাসনমূলক আক্রমণাত্মক মনোভাব এই ভীতিকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। সেই জন্য চীনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী হতে ও সীমান্ত বিষয়ক দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে ভারতকে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রলোভন দেখানো প্রয়োজন ছিল, সুতরাং আমেরিকা ভারতের সাথে একটি কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপন করে এবং নিজেদের মধ্যে পরমাণু সহযোগিতামূলক একটি মতৈক্যে পৌঁছায়... সেই সাথে আমেরিকা ভারতের সাথে অনেকগুলো অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর করে। সেই লক্ষ্যে দেশ দুটি ২০০৫ সালে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং ২০০৮ সালে একটি বেসামরিক পরমাণু সহযোগিতামূলক চুক্তিও সম্পাদন করে। এগুলোর সবকিছুই তাদের মধ্যকার নিরাপত্তা বিষয়ক সহযোগিতার দিগন্তকে আরও প্রসারিত করে। ফলশ্রুতিতে দেশদুটি বর্তমানে নজিরবিহীন সংখ্যক যৌথ সামরিক মহড়া পরিচালনা করছে; সেই সাথে ভারতে আমেরিকার তৈরি অস্ত্র বিপুল পরিমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে ...। সুতরাং যখন ভারতের সামরিক বাহিনীর জেনারেল দিপক কাপুর ২০০৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ বলেছিল যে, "ভারতের সামরিক বাহিনী একটি দ্বিমুখী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে" (দি ইকোনোমিক, ১৫-০২-২০১০), তখন থেকেই আমেরিকা পাকিস্তানকে চাপ দিয়ে চলেছে যেন সে ভারতের সাথে তার পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করে এবং পশ্চিমাঞ্চলে সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আফগানিস্তান ও উপজাতীয় এলাকার মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মনোনিবেশ করে। এই সবকিছু করা হচ্ছে যাতে করে ভারত উত্তর ফ্রন্টে চীনের সাথে যুদ্ধে মনোনিবেশ করতে পারে...। আমেরিকা ভারতের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্যও উদ্যোগ নিয়েছে, কারণ গত ৫ বছরে অন্য যেকোন দেশের তুলনায় ভারতে আমেরিকার রপ্তানির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের কনফেডারেশনের হিসাব মোতাবেক সেবা খাতে দ্বি-পক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ আগামী ৬ বছরে ৬০ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হতে পারে...। যাই হউক, ভারত চীনের সাথে ব্যাপক আকারে স্থলযুদ্ধের বিষয়ে ভীত, সেই সাথে কংগ্রেস পার্টির শাসকেরা আমেরিকার তুলনায় বৃটেনের প্রতি অধিকতর অনুগত এবং তারা আমেরিকার স্বার্থের জন্য চীনের সাথে পরাজয়ের যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অনিচ্ছুক ...!

৪. তাই আমেরিকা ভারতের দৃষ্টি পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, বিশেষ করে দক্ষিণ চীন সাগরে নিবদ্ধ করার প্রয়াস চালায়, এবং তেল-গ্যাসের লোভ দেখিয়ে আমেরিকার এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় কৌশলের অংশ হিসেবে চীনের সাথে মোকাবিলা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এবং এই জন্যই চীনের সাথে বিরোধপূর্ণ স্প্র্যাটলি দ্বীপের উপকূলে ভিয়েতনামের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারত তেল-গ্যাসের জন্য খোঁড়াখুড়ি করতে রাজি হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিউ ওয়াইমিন বলেছে যে, "আমরা দক্ষিণ চীন সাগরের বিরোধে বহিঃশক্তির কোন হস্তক্ষেপ দেখতে চাই না এবং আমরা কোন বিদেশী কোম্পানীকে এমন কোন কাজে নিয়োজিত দেখতে চাই না যা চীনের সার্বভৌমত্ব, অধিকার ও স্বার্থে আঘাত হানতে পারে" (দি মিডল ইস্ট, ২৮-১১-২০১১)। এর পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে দি পিপল্‌স্ ডেইলী নিউজপেপার ভারত ও ভিয়েতনাম উভয়কেই চীনের সাথে দায়িত্বজ্ঞানহীন দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অভিযুক্ত করেছে। আমেরিকা ভারতকে এই অঞ্চলে আরও আগ্রাসী হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করে আসছে। সেই জন্য ২২-০৭-২০১৩ তারিখে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জোসেফ বাইডেন ভারত সফরে যায় এবং সেই সফরের পূর্বে ওয়াশিংটনে সে মন্তব্য করেছিল যে ভারতকে প্রশান্ত মাহসাগরের পূর্বে অগ্রসর হতে প্রলুব্ধ করতে হবে। সে বলেছিল, "... ভারত ক্রমবর্ধমান হারে নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ও এর অগ্রবর্তী অঞ্চলে নিজের শক্তি সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে যা আমাদের জন্য সুখবর ।" সে আরও বলেছে যে, "আমরা ঐ অঞ্চলে ভারতের হস্তক্ষেপ এবং স্থল ও সমুদ্রপথে নতুন বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরীর প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই" (আই.আই.পি ডিজিটাল, ২৩-০৭-২০১৩)। এর এক মাস পূর্বে ২৪-০৬-২০১৩ তারিখে কেরি তার ভারতীয় অংশীদার শ্রী সালমান খুরশীদের সাথে নয়াদিল্লীতে দেখা করেছে এবং মার্কিন-ভারত কৌশলগত সংলাপের চতুর্থ দফা বৈঠকে যুগ্মভাবে সভাপতিত্ব করেছে। সেখানে তারা এশিয়া এবং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তাদের স্বপ্নকে দৃঢ়তাসহকারে পুনর্ব্যক্ত করে। সেই সাথে তারা আঞ্চলিক যোগাযোগকে শক্তিশালী করার বিষয়ে অব্যাহত সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করে এবং সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক নিরাপত্তার গুরুত্বকে দৃঢ়তাসহকারে পুনর্ব্যক্ত করে..." (আই.আই.পি. ডিজিটাল ২৪-০৬-২০১৩)। এসবকিছু এটাই প্রমাণ করে যে আমেরিকা ভারতকে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বে ঠেলে দিতে চায়, বিশেষ করে দক্ষিণ চীন সাগরে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে ঘিরে আমেরিকা নতুন পরিকল্পনা গ্রহণের পরে ভারতের উপর অব্যাহত চাপ সৃষ্টির পরেও সে গত দু'বছর ধরে আমেরিকার চাহিদা মোতাবেক সাড়া দেয়নি। এর কারণ হচ্ছে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস পার্টির বৃটেনের প্রতি আনুগত্য এবং চীনের সাথে যুদ্ধভীতি...।

৫. **অষ্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে** : আমেরিকা তার নিজের কক্ষপথে আবর্তনকারী অষ্ট্রেলিয়াকে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ করার জন্য কাজ শুরু করেছিল এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার কৌশলগত পরিকল্পনা অনুসারে চীনকে মোকাবিলার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার সাথে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এই জন্য আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে পররাষ্ট্র সচিব হিলারী ক্লিনটন, প্রতিরক্ষা সচিব লিওন প্যানেট্টা এবং প্রাক্তন সেনাপ্রধান মার্টিন ডিম্পসে অষ্ট্রেলিয়ার পার্থ সফরে গিয়েছিল এবং সেখানে তাদের অষ্ট্রেলিয় পক্ষের সাথে আলোচনায় বসেছিল। পার্থে অবস্থিত ওয়েষ্টার্ন অষ্ট্রেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়ান আমেরিকান সেন্টারের উদ্বোধন দিবসে হিলারী ক্লিনটন বলেছিল যে, "অষ্ট্রেলিয়া হচ্ছে ভারত মহাসাগরের সাথে প্রশান্ত মহাসাগরকে সংযোগকারী সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ও জ্বালানী পরিবহন রুটের প্রবেশদ্বার, অষ্ট্রেলিয়ায় উৎপাদিত জ্বালানী সম্পদ এই রুটগুলোর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে প্রবাহিত হয়ে থাকে।" সে আরো বলেছে, "এটা বিস্ময়কর নয় যে বৈদেশিক বিনিয়োগ অষ্ট্রেলিয়াতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, যার মধ্যে আমেরিকার বিনিয়োগের পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি, কারণ এটা বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এবং এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করা হচ্ছে আমেরিকার অন্যতম উদ্দেশ্য যেটাকে আমরা কখনও কখনও 'Pivot to Asia' বলে থাকি..."। সে আরো বলেছে, "আমেরিকা কখনো এশিয়াকে পরিত্যাগ করেনি, আমেরিকা এখনো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরাশক্তি এবং এটা বলবৎ থাকবে।" সে আরও উল্লেখ করে যে, "আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার ভবিষ্যতের জন্য এশিয়া-প্যাসিফিক ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল নিয়ে আমেরিকার চিন্তাধারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ"

(আই.আই.পি. ডিজিটাল, ১১-১৫-২০১২)। এই সেন্টারে হিলারী ক্লিনটন ভারতের প্রতি আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভারতের কাছ থেকে আমেরিকা কি চায় তা উল্লেখ করেছে। ভারতের "Look East" নীতিকে সমর্থন করা আমেরিকার কৌশলগত পরিকল্পনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে সে বলেছে যে, "ভবিষ্যতে অষ্ট্রেলিয়া-ভারতের যৌথ নৌমহড়াকে আমেরিকা স্বাগত জানায় এবং ২০১৩ সালে অষ্ট্রেলিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে গঠিত ইন্ডিয়ান ওশেন রিম এসোসিয়েসনের সাথে আমেরিকা জোটবদ্ধভাবে কাজ করতে উৎসুক ও আমেরিকা এটাতে ডায়লগ পার্টনার হিসেবে যোগদান করেছে" (একই সূত্র)। এই পরিকল্পনাগুলো অঞ্চলটি নিয়ে আমেরিকার চিন্তাধারাকে পরিষ্কার করে। আমেরিকা এই অঞ্চলে চীনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য অষ্ট্রেলিয়াকে সক্রিয় খেলোয়ার হিসেবে দেখতে চায়। এটা আরো প্রমাণ করে যে, ভারতের মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারেনি। দেশটি স্থলভাগে চীনের প্রতিবেশী এবং আমেরিকা দক্ষিণ চীন সাগরে ভারতের সাথে অষ্ট্রেলিয়াকে কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ করতে চায়। আমেরিকার নীতির সাথে অষ্ট্রেলিয়ার নীতি ভারতের চেয়ে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ পুঁজিবাদকে গ্রহণকারী একটি পশ্চিমাদেশ অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলোর মতই উপনিবেশিকতার মাধ্যমে আধিপত্য করতে আগ্রহী। একারণেই অষ্ট্রেলিয়া যেভাবে বৃটেনের সাথে কাজ করেছে সেভাবে সাম্রাজ্যবাদের স্বপ্ন নিয়ে আমেরিকাকে সহযোগিতা করছে এবং অষ্ট্রেলিয়া বৃটেন-আমেরিকা উভয়ের সাথেই সম্পৃক্ত কারণ সে এই দুই দেশের কক্ষপথেই আবর্তিত হয়...।

...এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্র অঞ্চলকে ঘিরে আমেরিকার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কংগ্রেস পার্টি কিংবা ভারতীয় জনতা পার্টির বিজয়ের ভূমিকার ক্ষেত্রে: সন্দেহ নেই যে এর ভূমিকা রয়েছে, কারণ কংগ্রেস পার্টি হচ্ছে এমন একটি দল যেটা সুদীর্ঘ সময় ধরে বৃটেনের প্রতি অনুগত...

৬. **জাপানের ক্ষেত্রে :** আমেরিকা জাপানে তার শক্তি বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং চীনের নিয়ন্ত্রণ হতে অঞ্চলটি রক্ষার জন্য জাপানকে আরো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছে। ০৬-০৪-২০১৪ তারিখে আমেরিকা ঘোষণা দিয়েছে যে সে জাপানে অতিরিক্ত মিসাইল প্রতিরক্ষা জাহাজ প্রেরণ করছে এবং আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব চাক হেগেল বলেছে যে, "২০১৭ সালের মধ্যে আমেরিকা জাপানে দুটি অতিরিক্ত এ.ই.জি.আই.এস ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রতিরক্ষা জাহাজ প্রেরণ করবে এবং এই পদক্ষেপটি হচ্ছে উত্তর কোরিয়ার নতুন ধরনের পরমাণু পরীক্ষার হুমকির জবাব।" সে চীনকে তার বিপুল ক্ষমতা অপব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে যে, "মহান জাতির কখনো শক্তি প্রয়োগ এবং ভীতি প্রদর্শন করা উচিত নয়, কারণ এগুলো সংঘর্ষের দিকে ধাবিত করে।" সে আরো বলেছে যে, "চীনের নিজস্ব সামরিক শক্তি ব্যবহারের বিষয়ে সে তার সাথে কথা বলতে চায় এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে চায়" (রয়টার্স, ০৬-০৪-২০১৪)। সে চীনকে সতর্ক করার জন্য রাশিয়ার দিকে ইংগিত করে বলেছে যে রাশিয়া ক্রিমিয়াকে নিয়ে যা করেছে চীনও জাপানের সাথে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ নিয়ে একই ধরনের আচরণ করছে; সে বলেছে যে, "তোমরা সমগ্র বিশ্বে অভিযান পরিচালনা করতে পারনা এবং ভৌগলিক সীমারেখাগুলোকে পূনরায় নির্ধারণ করতে পারনা এবং শক্তি প্রয়োগ, চাপ প্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে অগ্রাহ্য করতে পারনা, সেটা হোক প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট কোন দ্বীপ কিংবা ইউরোপের বড় কোন দেশ।" সে আরো বলেছে যে, "এছাড়াও ... আমি চীনের সাথে তার প্রতিবেশীদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে কথা বলব, শক্তি প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন খুবই মারাত্মক জিনিস যা শুধুমাত্র সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যায়।" গত সপ্তাহে আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের সাথে বৈঠক করেছে। বৈঠকে সে দক্ষিণ চীন সমুদ্র অঞ্চলকে ঘিরে আমেরিকার অধিকতর উদ্বেগের বিষয়ে সতর্ক করেছে (একই সূত্র)। জাপানের কিয়োডো নিউজ ০৫-০৪-২০১৪ তারিখে উল্লেখ করেছে, "এটা খুবই সম্ভাবনাময় যে আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব এবং জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইটসুনারী ওনোডেরা সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে জাপানের আত্মরক্ষার অধিকারের বিষয়টি অনুমোদনের জন্য আলোচনা করবে। এর সাথে ওনোডেরা অস্ত্র ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জামাদি হস্তান্তরের বিষয়েও আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিবের সাথে বৈঠকে আলোচনা করবে এবং উভয়পক্ষ প্রতিরক্ষা সরঞ্জামাদির বিষয়ে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতাকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছতে পারে।" এর অর্থ হচ্ছে যে, আমেরিকা চীনের নিয়ন্ত্রণ হতে এ অঞ্চল রক্ষার্থে জাপানকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখতে চায় যাতে করে তার উপর থেকে বোঝা লাঘব হয় এবং আমেরিকা এজন্যই জাপানীদের মাঝে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটাতে চায় যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে জাপানীরা আমেরিকা ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে নিজস্ব ক্ষমতা অর্জনের স্বপ্নকে লালন করবে।

৭. এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্র অঞ্চলকে ঘিরে আমেরিকার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কংগ্রেস পার্টি কিংবা ভারতীয় জনতা পার্টির বিজয়ের ভূমিকার ক্ষেত্রে: সন্দেহ নেই যে এর ভূমিকা রয়েছে, কারণ কংগ্রেস পার্টি হচ্ছে এমন একটি দল যেটা সুদীর্ঘ সময় ধরে বৃটেনের প্রতি অনুগত। এর রাজনৈতিক বুদ্ধি বিবেচনা ওল্ড লেডি বৃটেনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এজন্য কংগ্রেস পার্টি আমেরিকার জন্য সমস্যা তৈরি করে এবং এটা বৃটেনের মতই পলায়নপর মনোভাবসম্পন্ন। যদিও দলটি কিছু কিছু সামরিক চুক্তি ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাস্তবায়ন করে তথাপি বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্পর্ক ও কৌশলগত বিষয় মানতে চায়না, উদাহরণ স্বরূপঃ কংগ্রেস পার্টি ২০০৪ সালে যে নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিল সেই নির্বাচনের নির্বাচনী প্রচারণায় আমেরিকার প্রতি তার মনোভাব স্পষ্ট করে বক্তব্য প্রদান করেছিল এবং ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির নীতির সমালোচনা করেছিল। সেই বক্তব্যে বলা হয়েছিল, "এটা দুঃখজনক যে ভারতের মত একটি মহান রাষ্ট্র আমেরিকার আনুগত্য করার মত নিচু স্তরের সম্পর্কের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, যেখানে আমেরিকা ভারত সরকারের আনুগত্যকে নিজেদের পাওনা মনে করে। এজন্যই বিজেপি সরকার ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় পররাষ্ট্র নীতি ও জাতীয় নিরাপত্তাজনিত স্বার্থের বিষয় জলাঞ্জলি দিয়ে আমেরিকার স্বার্থ ও নীতিকে প্রাধান্য দিয়েছে।" এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে কংগ্রেস পার্টি আমেরিকার জন্য কতটা সমস্যা সৃষ্টিকারক। এরপরও আমেরিকা-ভারত কৌশলগত সংলাপ বন্ধ হয়ে যায়নি এবং জুন ২০১০-এ তারা সংলাপে ফিরে যায় যা ২০০৪ সালে প্রেসিডেন্ট বুশের আমলে শুরু হয়েছিল। সংলাপ ফোরামে আমেরিকার প্রতিনিধিদলের প্রধান পররাষ্ট্র সচিব হিলারী ক্লিনটনের বক্তব্যে এটা পরিষ্কার হয়: "ভারত হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং বিশ্বস্ত বন্ধু।" এজন্য যখন কংগ্রেস পার্টি আমেরিকার আনুগত্যকারী বিজেপিকে পরাজিত করে ক্ষমতায় আরোহন করে তখন থেকেই চীনকে মোকাবিলায় আমেরিকার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভারতকে নিয়োজিত রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, যদি না আমেরিকা ভারতকে বিশাল প্রাপ্তির দিকে প্রলুব্ধ করতে পারে এবং এটা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যাহোক, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারে ভারতের অনীহা নতুন কোন বিষয় নয়। বিজেপির সময়ও এমনটা ঘটেছিল, যদিও বিজেপি আমেরিকার নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিষয়টি সামনে আনেনি। এটা জানা উচিত যে, কংগ্রেস পার্টি পুরোপুরি বৃটেনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তার কাছেই তা হস্তান্তর করে যায় এবং আংশিকভাবেও নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করেনা। এর ব্যতিক্রম হয়েছে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৪

সাল পর্যন্ত নাতিদীর্ঘ সময়ে যখন আমেরিকার আনুগত্যকারী বিজেপি জয়লাভ করেছিল, এরপর আবার কংগ্রেস পার্টি ২০০৪-২০০৯ -এর নির্বাচনে বিজয়ী হয়।

০৭-০৪-২০১৪ তারিখে শুরু হওয়া নির্বাচনের ফলাফল ১৬-০৫-২০১৪ তারিখে ঘোষণা করা হবে। বিভিন্ন জরিপের ফলাফল অনুযায়ী এমনটাই অনুমান করা যাচ্ছে যে এ নির্বাচনে বিজেপি জোটই বিজয়ী হবে। যদি জনমত জরিপ সঠিক হয়ে থাকে তাহলে, বিজেপি জয়লাভ করে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করতে পারবে। তখন চীনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আমেরিকার পরিকল্পনা কংগ্রেস পার্টির শাসনামলের তুলনায় অধিকতর কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। যেরূপভাবে অতীতে আমেরিকা বিজেপির শাসনামলে সহজে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং কংগ্রেস পার্টির কয়েক দশকের শাসন অবসানের পরে আমেরিকা বিজেপির আমলে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছিল। আবার যখন ২০০৪ সালে কংগ্রেস পার্টি ক্ষমতায় আসে তখন তা ভারতকে ঘিরে আমেরিকার পরিকল্পনা ভন্ডুল করে দিতে থাকে এবং কংগ্রেস পার্টি আমেরিকার পরিকল্পনায় সহায়তা করার পরিবর্তে সুবিধাজনক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে কৌশলে আমেরিকাকে পরিহার করতে থাকে।

৪. চীন এবং ভারতের তুলনায় চীন অনেকগুলো ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে: চীন যদিও রাষ্ট্র হিসেবে তার আদর্শ বাস্তবায়ন করেনা এবং পররাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক নীতিতে তার আদর্শকে অন্তর্ভূক্ত করেনা, সেই সাথে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়েও সে তার আদর্শকে পরিত্যাগ করে থাকে, তথাপি চীন তার শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট পার্টির নাম ব্যবহার করে, যাতে করে পার্টির ও পার্টির সদস্যদের স্বার্থ এবং রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। এগুলোই চীনকে একটি অবিভক্ত রাষ্ট্রে কিংবা শক্তিশালী কোন রাষ্ট্রের কক্ষপথে আবর্তিত পরনির্ভর দেশে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করে চলেছে এবং স্বাধীনভাবে নিজস্ব নীতিসমূহ বাস্তবায়নে সক্ষম রেখেছে। ফলশ্রুতিতে এটি এমন একটি রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে যেটি বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি হওয়ার আকাঙ্খা করে। জাতীয় প্রতিরক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং যুবক অফিসারদের প্রশিক্ষণদানকারী কর্ণেল লি. মিনগো তার লেখা "দি চাইনিজ ড্রিম" নামক বইতে এটা প্রকাশ করেছে। সে চীনকে সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করার আহ্বান জানিয়ে বর্তমান বিশ্বের নায়ক আমেরিকাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য দ্রুত অগ্রসর হওয়ার তাগিদ দিয়েছে, চাইনিজদের অপমানকর অবস্থা থেকে নিজেদের উত্তরণ ঘটিয়ে সম্মানজনক অবস্থায় আরোহণ করে বিশ্বের এক নম্বর রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। সে বলেছে যে, চীন যদি একুশ শতকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশে পরিণত হতে না পারে এবং একটি পরাশক্তি হিসেবে নিজেদের উত্থান ঘটাতে না পারে তাহলে এটি সুনিশ্চিতভাবেই একটি নিম্নস্তরের রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

চীনের শক্তি ও চ্যালেঞ্জ করার মনোভাব দুটি'ই রয়েছে। চীনের উদ্দেশ্য যদি শুধুমাত্র নিজের এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে এবং কেবলমাত্র নিজস্ব অঞ্চলে আমেরিকার গতিবিধির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমেরিকাকে মোকাবেলা করার চিন্তায় সীমাবদ্ধ না থাকে..., এবং চীন যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুঁজিবাদকে আদর্শ হিসেবে মেনে নিতে শুরু না করে, বিশেষ করে অর্থনীতিতে... তাহলে সে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি জোড়ালো ভূমিকা রাখার ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হতে পারে এবং এটা আমেরিকার স্বার্থের উপর খুব শক্তিশালী আঘাত হবে। যা হোক, চীনের একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী রয়েছে এবং সে তার নিজস্ব অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, ভারতের রাষ্ট্র হিসেবে কোন আদর্শ নেই এবং আদর্শ থেকে উৎসারিত কোন চিন্তাধারাও নেই। শুধুমাত্র পশ্চিমাদের, বিশেষ করে বৃটেনের আনুগত্য নিশ্চিতের জন্য সে পুঁজিবাদ বাস্তবায়ন করে এবং এই আদর্শ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য এটা নয় যে ভারত জেগে উঠবে কিংবা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলোতে যেভাবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পুঁজিবাদ বাস্তবায়িত হয়েছে ঠিক একইরকম ভাবে ভারতেও সেটা ঘটেছে এবং এখনও চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এই কারণে তারা স্বাধীন হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করছে না এবং শক্তিশালীভাবে, দ্রুততার সাথে ও নিজস্ব বিচার বিবেচনার সাথে কাজ করার কোন আগ্রহও তাদের নেই। ভারত একটি অধঃস্তন তাবেদার রাষ্ট্র হিসেবে টিকে আছে এবং এর পরিকল্পনা ও নীতি স্বাধীন বা অন্যের প্রভাবমুক্ত নয়। রাজনৈতিক অঙ্গনেও এর গতিবিধি খুবই ধীরগতিসম্পন্ন যা সবসময় অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই রাষ্ট্রটির নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা নেই এবং এর উদ্যোগ নিতেও সে সক্ষম নয়, বরং এটি হয় বৃটেনের নতুবা প্রথম প্রভূ আমেরিকার নিয়ন্ত্রণাধীন। এজন্যই এই ক্ষেত্রে ভারত চীনের চেয়ে ব্যতিক্রম; ভারত বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অনগ্রসরমান এবং যে কোন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তির মাপকাঠিতে তারা বিশৃঙ্খল ও যেসব ব্যক্তিবর্গ রাজনৈতিক পরিমন্ডলে কাজ করছে তারাও কোন ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। তাই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতি সর্বক্ষেত্রে আসন গেড়ে বসেছে এবং সকল রাজনীতিবিদদের গ্রাস করে যাচ্ছে। ভারতের পক্ষে একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক কিংবা আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়া খুবই কঠিন এবং এটা ভবিষ্যতে সর্বোচ্চভাবে আমেরিকা বা বৃটেন কিংবা উভয়ের মতো কোন বৃহৎ আদর্শিক রাষ্ট্রের কক্ষপথে আবর্তিত রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনাটি ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত-চীনের তুলনামুলক বাস্তবতা; অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বলা যায় যে, চীনের অর্থনীতি ভারতের অর্থনীতির তুলনায় চার গুণ বৃহৎ, যেখানে চীন তার দেশের দারিদ্র সীমা কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে সেখানে বিশ্বের ৬৬% গরীব লোক ভারতের নাগরিক। ভারত চীনের সাথে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে পারবে না। চীন একটি বৃহৎ শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলেছে যা তাকে বিপুল পরিমান নগদ টাকার সঞ্চয় এনে দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে সে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। চীনের তুলনায় ভারত উৎপাদন সক্ষমতা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভারী যন্ত্রপাতি তৈরী এবং আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এর মানে এটা নয় যে, ভারতে এসবের কিছুই নেই বরং তারা চীনের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে...

সামরিক সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, চীনের আনুষ্ঠানিক সামরিক বাজেটের পরিমান হচ্ছে ১১৯ বিলিয়ন ডলার যেটা ভারতের ৩৮ বিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা বাজেটের তুলনায় তিন গুণ বেশি। চীন তার সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। এখন তারা নিজেদের জন্য বিশালাকৃতির সামরিক গুদাম তৈরী করছে যেখানে জাহাজ, ট্যাংক ও যুদ্ধবিমানের মতো সামরিক সরঞ্জামাদি তৈরী ও সংরক্ষনের ব্যবস্থা রয়েছে এবং নিজস্ব নৌবহর সম্প্রসারণ করেছে যা এই অঞ্চল নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যাহা হউক, ভারত সম্প্রতি সামরিক আধুনিকায়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়নকল্পে অর্থের সংস্থানে সক্ষমতা অর্জনের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে, যদিও তা অনেক ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। ভারত এখনও বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ অস্ত্র আমদানিকারক দেশগুলোর অন্যতম এবং ভারতের নিজস্ব সামরিক সক্ষমতা অর্জনের দুই দশকের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ষ্টকহোমের আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা ইন্সটিটিউটের একজন উচ্চপদস্থ গবেষক পিটার ডি. ওয়াইজম্যান বলেছেন, "আমি মনে করি না বিশ্বে এমন কোন দেশ রয়েছে যেটা ভারতের মতো আন্তরিকভাবে অস্ত্র তৈরীর চেষ্টা করে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে" ('বিশ্বের সবচেয়ে বড় অস্ত্র আমদানিকারক দেশ ভারত আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অস্ত্র কিনতে চায়', দি নিউ ইয়র্ক টাইমস, মার্চ ২০১৪)

...১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

লিফলেট : হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ কুয়েত

খিলাফত আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ওয়াদা এবং রাসূল (সাঃ) এর ভবিষ্যৎবাণী

২৮শে রজব, ১৩৪২ হিজরীতে (৩রা মার্চ, ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ) ব্রিটিশ দালাল মুস্তফা কামালের মাধ্যমে উপনিবেশিক কাফির কর্তৃক তুরস্কের ইস্তাম্বুলে খিলাফত ধ্বংসের পর ৯৩ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। তখন থেকেই, মুসলিমরা ইমাম বিহীন অবস্থায় জীবন যাপন করছে যে ইমাম মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তার পতাকাতলে, এবং অভিভাবকহীন অবস্থায় রয়েছে যে অভিভাবক তাদের দেখাশুনা করে, এবং তাদের সম্পদের রক্ষা করে, এবং উম্মাহ তাকে ছাড়া রয়েছে যে উম্মাহ'র পবিত্রতা ধরে রাখে এবং আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করে, এবং যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব রাসূল (সাঃ) এর ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা করে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়। খিলাফত ধ্বংসের পর, সেই ইমামের পদটি শুন্য হয়ে আছে যার পিছনে থেকে আমরা যুদ্ধ করি এবং কাফিরদের আগ্রাসন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করি। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, **"ইমাম (খলীফা) হচ্ছে ঢাল স্বরূপ যার পিছনে থেকে মুসলিমরা যুদ্ধ করে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করে।"** [সহীহ্ মুসলিম]

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শুধুমাত্র নামায, রোযা ও হজ্জের বিধানকেই বাধ্যতামূলক করেননি, বরং তিনি খলীফা নিয়োগকেও আমাদের জন্য আবশ্যক করেছেন জিহাদকে এগিয়ে নেবার জন্য ও হুদুদ বাস্তবায়নের জন্য... এবং অন্যান্য সকল বিধান প্রয়োগের জন্য যা উম্মাহ'র জীবন পরিচালনার সকল বিষয়াবলী দেখাশুনার সাথে সংশ্লিষ্ট। শারী'আহ্ সমগ্র মুসলিম উম্মাহ'র একজন খলীফা ছাড়া তিন রাতের বেশী অতিবাহিত হওয়াকে নিষিদ্ধ করেছে। আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, **"যে ব্যক্তি আনুগত্যের (বাই'আত) শপথ থেকে তার হাত ফিরিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার সাথে এমন ভাবে সাক্ষাৎ করবেন যে, ঐ ব্যক্তির পক্ষে কোন দলিল থাকবে না, এবং যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে তার কাঁধে (কোন খলীফার) বাই'আত (আনুগত্যের শপথ) নেই, তবে তার মৃত্য হচ্ছে জাহেলী যুগের মৃত্যু।"** [সহীহ্ মুসলিম]

খিলাফত সরকার কাঠামো ছাড়া অন্য কোন শাসনব্যবস্থা মুসলিমদের জন্য অনুমোদিত নয়, আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, **"বনী ইসরাইলের শাসন করতেন নবীগণ, যখন এক নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন তার স্থলে অন্য নবী স্থলাভিষিক্ত হতেন, কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী আসবেন না। শীঘ্রই অধিক সংখ্যক খলীফারা আসবেন।** তখন তারা জিজ্ঞাসা করলেন: **ইয়া রাসূলুল্লাহ্ তখন আপনি আমাদের কি করতে আদেশ দেন? তিনি (সাঃ) বললেন, তোমরা (তাদের) একজনের পর একজনের বাই'আত পূর্ণ করবে।"** [সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম] রাসূল (সাঃ)-এর পর মুসলিমদের শাসক ছিলেন খলীফাগণ, যা রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর পর খলীফা নিয়োগের বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে সাহাবাদের (রা.) ঐক্যমতের মাধ্যমে দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, মুসলিমদের জন্য গণতান্ত্রিক বা গণপ্রজাতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা, বা ফেডারেল সরকার ব্যবস্থা, বা কোন সাম্রাজ্য অথবা কোন রাজতন্ত্র অনুমোদিত নয় বরং ইসলামের শাসনব্যবস্থার কাঠামো হলো একমাত্র খিলাফত।

যদিও খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজ ফরযে কিফাইয়া, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের জন্য একজন খলীফা নিয়োগ না হন ততক্ষণ পর্যন্ত এই বাধ্যবাধকতা থেকে কোন মুসলিমই দায়মুক্ত হতে পারবে না। এই ফরয কাজ সম্পাদনের পদ্ধতি অবশ্যই রাসূল (সাঃ) এর পদ্ধতিতে হতে হবে, অন্য কোন পদ্ধতিতে নয়; আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য আল্লাহ্'র রাসূলের (সাঃ) মাঝে অনুকরণযোগ্য উত্তম আদর্শ রয়েছে, এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্'র সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের (মুক্তির) আশা করে, (সর্বোপরি) সে বেশী পরিমাণ আল্লাহ্'র স্বরণ করে।"
[সূরা আল-আহ্যাব : ২১]

এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন,

"এবং রাসূল (সাঃ) যা কিছুর (অনুমতি) দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। এবং আল্লাহ্'কে ভয় কর; অবশ্যই আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা আল-হাশর : ০৭]

এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলের (সাঃ) সীরাতের (জীবনী) প্রতি অনুগত থাকা আবশ্যক; ওহী নাযিলের শুরু থেকে মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এবং দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলাম ও জাহেল সমাজ থেকে ইসলামী সমাজে রূপান্তর পর্যন্ত।

হে মুসলিমগণ!

খিলাফত আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ওয়াদা এবং রাসূলের (সাঃ) সুসংবাদ সংবলিত ভবিষ্যৎবাণী। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে, তাদের সাথে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি জমীনে তাদের অবশ্যই খিলাফত (শাসন কর্তৃত্ব) দান করবেন, যেমনিভাবে তিনি তাদের পূর্বের লোকদের খিলাফত (শাসন কর্তৃত্ব) দান করেছিলেন, যে জীবন বিধান তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন তা সুদৃঢ় করে দেবেন, তাদের ভীতিজনক অবস্থার পর তিনি তাদের অবস্থাকে (নিরাপত্তা ও) শান্তিতে বদলে দিবেন, (তবে এ জন্য শর্ত হচ্ছে) তারা শুধু আমারই গোলামী করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না; এরপরও যে (এবং যারা) তাঁর নিয়ামতের নাফরমানী করবে তারাই গুনাহ্গার (বলে পরিগণিত হবে)।" [সূরা আন-নূর : ৫৫]

রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তারপর

তাঁর ইচ্ছায় এটির পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে নবুয়্যতের আদলে খিলাফত, তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, অতঃপর তিনি তারও পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর আসবে যন্ত্রণাদায়ক বংশের শাসন, তা থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, একসময় আল্লাহ্'র ইচ্ছায় এরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে জুলুমের শাসন, এবং তা তোমাদের উপর থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, তারপর তিনি তা অপসারণ করবেন। তারপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত, নবুয়্যতের আদলে। এরপর তিনি (সাঃ) নীরব থাকলেন।"
[মুসনাদে ইমাম আহ্‌মদ]

রাসূল (সাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য সুসংবাদ দিয়ে তাঁর হাদীসটি শেষ করেছেন, সেটা হলো বর্তমান জুলুম আর অত্যাচারের শাসনের পর নবুয়্যতের আদলে খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

হে মুসলিমগণ!

বর্তমানে আমরা দেখছি উম্মাহ্ তার পরিত্রাণের পথ খুঁজে ফিরছে, আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে মুসলিম উম্মাহ্'র আবার ফিরে আসার নির্দশন। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে যালিমের বিরুদ্ধে উম্মাহ্'র ক্রোধ প্রকাশ ও উম্মাহ্'র হারিয়ে যাওয়া কর্তৃত্ব আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসার জাগরণ শুরুর মাধ্যমে এবং একইভাবে এর গৌরবের উৎস খিলাফাহ্ রাশিদাহ্'র দাবি সর্বত্র বিরাজ করছে।

সুতরাং হে মুসলিমগণ! এই অন্ধকার দূর করার জন্য এবং আরও একবার খিলাফতের আলো ফিরিয়ে আনার জন্য জেগে উঠুন। তখনই আমরা অবস্থান করবো ওকাবের পতাকাতলে, রাসূল (সাঃ) এর পতাকাতলে, এবং আখিরাতে বিচারের দিন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র আরশের সুশীতল ছায়ায় যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনও ছায়া থাকবে না এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা চাইলে, আমরা তাঁদের মধ্যের কেউ হব যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"(তারা অবস্থান করবে) যথাযোগ্য সম্মানজনক জায়গায়, বিশাল ক্ষমতার অধিকারী সার্বভৌম আল্লাহ'র সান্নিধ্যে।" [সূরা আল ক্বামার : ৫৫]

বর্তমান শাসকদের জুলুম ও তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে উম্মতের মুক্তি আপনাদের কর্তৃক ইসলামের সাহায্য এবং যারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে তাদের সাথে আপনাদের কাজ করা ছাড়া সম্ভব নয়, যে রাষ্ট্র এই জালিম শাসক এবং তাদের সহযোগীদের ও যারা তাদেরকে অনুসরণ করে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবে, যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইচ্ছায় আপনারা দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ অর্জন করবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"তোমাদের মধ্যে তারা কখনো একই রকম (মর্যাদার অধিকারী) হবে না, যারা (মক্কার) বিজয় সাধিত হওয়ার আগে (আল্লাহ্'র পথে) ব্যয় করেছে এবং (ময়দানেও) সংগ্রাম করেছে; তাদের মর্যাদা ওদের তুলনায় অনেক বেশী যারা বিজয় সাধিত হবার পর আল্লাহ্'র পথে অর্থ ব্যয় করেছে এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে; (অবশ্য) আল্লাহ্ এদের সবাইকেই উত্তম পুরস্কার প্রদানের ওয়াদা দিয়েছেন; তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে জ্ঞাত রয়েছেন।" [সূরা আল-হাদীদ : ১০]

তিনি আরও বলেন,

"ঈমানদার লোকদের যখন তাদের পারস্পারিক বিচার ফয়সালার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান জানানো হয়, তখন (খুশী মনেই) তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং তা (যথাযথভাবে) মেনেও নিলাম; বস্তুত এরাই হচ্ছে সফলকাম।" [সূরা আন-নূর : ৫১]

২১ রজব, ১৪৩৫ হিজরী
২০ মে, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ

মন্তব্যঃ

সমুদ্রের কৌশলগত অঞ্চল ভারতের কাছে বিক্রি করে বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সরকারের বিজয়ের ছিটগ্রস্থ দাবি!

গত ০৭/০৭/২০১৪ তারিখে হেগে অবস্থিত জাতিসংঘের একটি ট্রাইব্যুনাল বসতিহীন একটি দ্বীপকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ-ভারতের ৪০ বছরের বিতর্কের বিষয়ে রায় প্রদান করেছে। হাসিনা সরকার বিষয়টির উপর রায় চেয়ে এই ট্রাইব্যুনালের দরবারে গিয়েছিল এবং এই রায়টিকে তারা সমুদ্র-বিজয় বলে অভিহিত করেছে কারণ ২৫,০০০ বর্গ কিলোমিটারের ওই এক্সক্লুসিভ অর্থনৈতিক অঞ্চলের চার-পঞ্চমাংশ বাংলাদেশ পেয়েছে। ততসত্ত্বেও, ভারতকেই স্পষ্টতঃ এই রায়ে উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল কারণ দ্বীপটি ভারতের কবলেই গিয়েছে।

মন্তব্য:

বঙ্গোপসাগরের তীর হতে দূরে অবস্থিত দক্ষিণ তালপট্টি নামক দ্বীপটিতে রয়েছে তেল-গ্যাসের বিশাল ভান্ডার। ভারতের মূলধারার কিছু প্রখ্যাত সংবাদ মাধ্যম এই রায়ের প্রেক্ষিতে জানিয়েছে এই দ্বীপটির উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ এবং সংযুক্ত হারিয়াভাঙ্গা নদীর ভেতরের প্রবেশাধিকার ভারতের জন্য এক

বিশাল কৌশলগত বিজয় কারণ এই অঞ্চলটি ভারতের সর্ববৃহৎ হাইড্রোকার্বন ভান্ডার তথা অন্ধ্র প্রদেশের কৃষ্ণা-গোদাভারি অববাহিকার চেয়েও দিগুণ তেল-গ্যাস ধারণ করে। এটা খবরে এসেছিল যে ভারত সেই ২০০৬ সালেই এই অঞ্চলে ১০০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট হাইড্রোকার্বন মজুদ পেয়েছিল। সেই সময় থেকেই ভারতীয় বিএসএফ এই অঞ্চলে অবস্থান করে আসছিল।

যেহেতু রায়টির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলটি ভারতের করায়াত্তে চলে গেল, এটা আসলেই জাতিকে অবাক করেছে কি করে একে হাসিনা সরকার সমুদ্র-বিজয় বলে দাবি করছে! তাছাড়া দ্বীপটি অনেক আগেই পানিতে তলিয়ে গিয়েছে সরকারের এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে, বিষয়টি ট্রাইব্যুনালে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে শুরু থেকেই সরকার জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে এবং প্রতারণামূলকভাবে ভারতকে অঞ্চলটি দখলে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের জনগণের জন্য হাসিনা এবং তার মতো প্রতারক শাসকদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। এই শাসকরা কখনই দেশের মানুষের পরোয়া করেনি, বরং সব সময় তাদের মার্কিন-ভারত প্রভুদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে আসছে। এরা হচ্ছে সে সব মুনাফিক যারা দাবি করে যে তারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার উপর বিশ্বাসী, কিন্তু তারপরও তারা কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী ব্যবস্থার রায় কামনা করে:

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তারা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা সেটাকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়।"
[সূরা আন-নিসা : ৬০]

মুসলিমদের উপর দায়িত্ব হল এই পুতুল সরকারগুলোকে উৎখাত করা যারা সর্বদাই সাম্রাজ্যবাদী কাফির এবং জাতিসংঘসহ তাদের অত্যাচারের হাতিয়ারগুলোর সামনে অবনত থাকে। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোন ভাবেই মুসলিমদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে দেয়া যাবে না। মুসলিম ভূমিগুলোর এসব তাঁবেদার শাসকদের, যারা উম্মাহ্'র প্রাকৃতিক সম্পদ কাফিরদের প্রতিষ্ঠানগুলোর দারস্থ হয়ে হাতছাড়া করে দিচ্ছে, হটানোর ক্ষেত্রে মুসলিমদের পক্ষ থেকে যে কোন রকমের গাফেলতি কবিরা গুনাহ্ হিসেবে সাব্যস্ত হবে মুনকার মেনে নেয়ার কারণে।

০৩ শাওয়াল, ১৪৩৫ হিজরী
৩০ জুলাই, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া অফিসের জন্য লিখেছেন
ইমাদুল আমিন, হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ
-এর মিডিয়া অফিসের সদস্য

...২৮ পৃষ্ঠার পর থেকে

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা...

পরিমাণ অর্জনের সাথে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ বন্টনের কোন সম্পর্ক নেই।

পুঁজিবাদীরা বলে দাম উৎপাদনের প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে এবং একজন ব্যক্তির শ্রম ব্যয় করার লক্ষ্যই হল বস্তুগতভাবে পুরস্কৃত হওয়া। এ দৃষ্টিভঙ্গী ভুল এবং বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। মানুষ অনেক সময় নৈতিক পুরস্কার পাওয়ার জন্য শ্রম ব্যয় করে, যেমন স্রষ্টার কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার জন্য অথবা কোন নৈতিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য, যেমন: কারও অনুগ্রহ ফিরিয়ে দেয়া। মানুষের চাহিদা বস্তুগত হতে পারে, যেমন: বস্তুগত লাভ; এটি আধ্যাত্মিকও হতে পারে, যেমন: মুক্তি লাভ করা; অথবা নৈতিক, যেমন: প্রশংসা করা। সুতরাং কেবলমাত্র বস্তুগত চাহিদাকে বিবেচনা করা ভুল। বাস্তবে একজন ব্যক্তি তার বস্তুগত চাহিদা পূরণের চেয়ে আধ্যাত্মিক বা নৈতিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে অনেক উদারভাবে ব্যয় করতে পারে। সুতরাং দামই উৎপাদনের একমাত্র প্রণোদনা নয়। একজন রাজমিস্ত্রী মাসের পর মাস পাথর কেটে মসজিদ বানানোর জন্য আত্মনিয়োগ করতে পারে, একটি কারখানা কিছুদিনের উৎপাদন দরিদ্রদের মধ্যে বন্টনের জন্য বরাদ্দ করতে পারে এবং একটি জাতি কিছু অথবা সব প্রচেষ্টা তার ভূমিকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য ব্যয় করতে পারে। এ ধরনের উৎপাদন দাম দ্বারা প্রণোদিত নয়। তাছাড়া বস্তুগত পুরস্কার কেবলমাত্র দামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি অন্য পণ্য ও সেবার মাধ্যমেও আসতে পারে। সুতরাং দামকে উৎপাদনের একমাত্র প্রণোদনা বিবেচনা করা ভুল।

পুঁজিবাদের একটি বড় অনিয়ম হল দামকে সমাজের লোকদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের জন্য একমাত্র নিয়ন্ত্রক হিসেবে বিবেচনা করা। তারা বলে দাম হল একমাত্র প্রতিবন্ধকতা যা ভোক্তাকে তার আয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোন কিছুর মালিকানা লাভ ও সে অনুসারে ব্যয় করতে বাধ্য করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আয় যতটুকু অনুমোদন করে ঠিক ততটুকুর মধ্যে ব্যয়কে সীমিত রাখে। একইভাবে কিছু পণ্যের দাম বৃদ্ধি ও অন্য কিছুর দামহ্রাসের মাধ্যমে এবং কিছু লোকের হাতে অর্থের সুলভতা ও অন্য কিছু লোকের হাতে এর দুষ্প্রাপ্যতার কারণে দাম ভোক্তাদের মধ্যে সম্পদের বন্টনকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি যে পরিমাণ সম্পদের অংশীদার হয় তা তার মৌলিক চাহিদার সমপরিমাণ নয়, বরং পণ্য বা সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার যতটুকু অবদান রয়েছে অর্থাৎ ভূমি বা মূলধনের ক্ষেত্রে সে যতটুকুর মালিক সে পরিমাণ অথবা সে কাজের বা প্রজেক্টের যতটুকু করেছে সে পরিমাণ।

এ মূলনীতি থেকে অর্থাৎ দাম বন্টনের নিয়ন্ত্রক থেকে বলা যায় যে, পুঁজিবাদ কার্যকরভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, মানুষ একটি সুন্দর জীবন পাবে না যদি সে পণ্য ও সেবা উৎপাদনে অবদান রাখতে সামর্থবান না হতে পারে। যে ব্যক্তি অবদান রাখতে অক্ষম অর্থাৎ সে যদি জন্মসূত্রে শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম থাকে তাহলে সে জীবন পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না এবং তার চাহিদা পূরণের জন্য সম্পদ নেয়ার ক্ষেত্রেও তার যোগ্যতা নেই। তাছাড়া যে শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়ে জন্ম লাভ করেছে এবং সে তার ইচ্ছেমত সম্পদ সৃষ্টি ও মালিকানা লাভ করতে সমর্থ¨। এ ধরনের লোক বিলাসী জীবনযাপনের মাধ্যমে খরচ করার যোগ্য এবং তার সম্পদ দ্বারা অন্যদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভূত্ব করার যোগ্যতা রাখে। তাছাড়া বস্তুগত লাভ খোঁজার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির প্রণোদনা বেশী সে ব্যক্তি সম্পদের মালিকানা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যদের ছাড়িয়ে যাবে, আর অন্যদিকে যার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি (উপার্জনের সময় যেগুলো তাকে নিয়ন্ত্রণ করে) জোঁক বেশী শক্তিশালী তার মালিকানা অর্জন বা সম্পদ অর্জন অন্যদের তুলনায় কম হবে। এ প্রক্রিয়া জীবন থেকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নিয়ামকসমূহকে বাদ দিয়েছে এবং বস্তুগত চাহিদা পূরণের বিভিন্ন উপায় অনুসন্ধানে লালায়িত বস্তুগত সংগ্রামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক জীবন তৈরি করেছে। পুঁজিবাদ প্রয়োগকারী প্রতিটি দেশে ক্রমাগত এটাই ঘটেছে। যেসব দেশ পুঁজিবাদকে গ্রহণ করেছে সেসব দেশে ভোক্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন উৎপাদক পুঁজিপতিদের একচেটিয়া আধিপত্য গড়ে উঠেছে। জনগণের ছোট্ট একটি অংশ, বড় তেল কোম্পানী, স্বয়ংক্রিয় যান, ভারী শিল্প করপোরেশনের মালিক হওয়ায় তারা যা উৎপাদন করে সেসবের উপর যথেচ্ছভাবে একটি দাম বসিয়ে তারা ভোক্তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। যা একটি জোড়াতালি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে ধাবিত করে। জাতীয় অর্থনীতিকে রক্ষা, ভোক্তাদের রক্ষা এবং কিছু পণ্যের ব্যবহারকে হ্রাস করা এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্ব সীমিত করার জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ কিছু

...১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বই অনুবাদ : গত সংখ্যার পর থেকে...

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

লেখক: হিযবুত তাহ্‌রীর-এর প্রতিষ্ঠাতা
শাইখ তাক্বি উদ্দীন আন-নাবাহানি

পুঁজিবাদ মূল্যকে প্রকৃত নয়, বরং আপেক্ষিক হিসেবে বিবেচনা করে, এবং এটি একটি অনুমানভিত্তিক পরিমাপ হিসেবে পরিগণিত হয়। বাজারে সুপ্রাপ্যতার ভিত্তিতে এক হাত কাপড়ের মূল্য হল তা থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগিতা। এর মূল্য বলতে যে পরিমাণ পণ্য ও সেবা এর জন্য বিনিময় করা যাবে তাও বুঝায়। এক হাত কাপড়ের বিনিময় হিসেবে যদি অর্থ পাওয়া যায় তাহলে তা 'দাম' হিসেবে বিবেচিত হয়। তাদের দৃষ্টিতে এ দু'টি মূল্য স্বতন্ত্র, এবং এগুলোর আলাদা নাম রয়েছে: উপযোগিতা এবং বিনিময়ের মূল্য। এ সংজ্ঞা অনুসারে মূল্যের এই অর্থ ভুল। কারণ কোন পণ্যের মূল্য হল পণ্যটির দুষ্প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ঐ পণ্যের মধ্যে থাকা উপযোগিতার পরিমাণ। সুতরাং একটি পণ্যের জন্য সত্যিকারের দৃষ্টিভঙ্গী হল এর দুষ্প্রাপ্যতাকে বিবেচনা করে এর মধ্যে থাকা উপযোগিতা পর্যবেক্ষণ করা, তা এই পণ্যটি শুরু থেকেই কোন ব্যক্তির মালিকানায় শিকারের মাধ্যমেই আসুক অথবা বেচাকেনার মাধ্যমেই আসুক অথবা এটি ব্যক্তি সম্পর্কিত হোক অথবা কোন জিনিষ সম্পর্কিত হোক। সুতরাং মূল্য এমন একটি সুনির্ধারিত বিষয়ের নাম যার সুনির্দিষ্ট বাস্তবতা রয়েছে এবং এটি কোন আপেক্ষিক বিষয় নয় যা কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়, অন্যক্ষেত্রে নয়। সুতরাং মূল্য একটি বাস্তব পরিমাপ, আপেক্ষিক নয় সুতরাং অর্থনীতিবিদদের মূল্য সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গী তা এর ভিত্তি থেকেই ভুল।

প্রান্তিক উপযোগিতা বা মূল্য বলতে মূল্যর এমন একটি হিসাব বা অনুমানকে বুঝায় যা পণ্য বন্টনের নিকৃষ্টতম পরিস্থিতিতে উৎপাদন পরিচালনার অভিপ্রায়ে প্রাক্কলিত। ফলতঃ একটি পণ্যের মূল্য হিসাব করা হয় সর্বনিম্ন সীমার উপর ভিত্তি করে যাতে উৎপাদন সুনিশ্চিতভাবে চলতে থাকে। প্রান্তিক উপযোগিতা একটি পণ্যের প্রকৃত মূল্য নয় অথবা এমনকি পণ্যের দামও নয়। কেননা পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতাকে বিবেচনায় এনে হিসাব করার সময় এর মধ্যে থাকা উপযোগিতাই হল এর মূল্য। এর মূল্য কমবে না যখন পরবর্তীতে এর দাম পড়ে যায় এবং বৃদ্ধি পাবে না যদি এর দাম বেড়ে যায়। কারণ মূল্যায়ন করার সময় এর মূল্য বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং প্রান্তিক উপযোগিতা তত্ত্ব মূল্য সম্পর্কিত কিছু নয়, ববং এটি দামের সাথে সংশ্লিষ্ট। এমনকি পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতেও দাম ও মূল্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দামের হিসাবকে যা পরিচালনা করে তা হল চাহিদার প্রাচূর্যতার সাথে সরবরাহের ঘাটতি অথবা সরবরাহের প্রাচূর্যতার সাথে চাহিদার ঘাটতি। এগুলো একটি পণ্যের উৎপাদনের পরিমাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত, বন্টনের সাথে নয়। বরং মূল্য, মূল্যায়নের সময় পণ্যের মধ্যে থাকা মোট উপযোগিতার পরিমাণ যা পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতাকে মাথায় রেখে পরিমাপ করা হয় যদিও তা পণ্যের মূল্য নির্ধারণের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং সরবরাহ ও চাহিদা মূল্যকে প্রভাবিত করে না।

সুতরাং মূল্যের বিষয়টি এর গোড়া থেকেই ভুল। সে কারণে ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা যে কোন কিছু ভুল হতে বাধ্য। যদি শ্রম কিংবা অন্য কোন পণ্য হতে প্রাপ্ত সুবিধা মাপকাঠি হিসেবে ধরে নিয়ে পণ্যের মধ্যে উপস্থিত সুবিধাকে পরিমাপ করা হয় তবে সে মূল্যায়নটি সঠিক হবে এবং স্বল্পমেয়াদে অনেক বেশী স্থিতিশীলতা প্রদান করবে। যদি মূল্য দামের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয় তাহলে মূল্যায়ন প্রকৃত হবে না, আপেক্ষিক হবে। এবং বাজার অনুসারে এটি সর্বদা পরিবর্তিত হতে থাকবে। এক্ষেত্রে এটিকে মূল্য হিসেবে বিবেচনা করা সঠিক হবে না বিধায় মূল্য শব্দটি এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সমীচীন নয়। কারণ সেক্ষেত্রে এটি পণ্যের গুণাগুণ অনুযায়ী নয় বরং বাজার অনুযায়ী টাকা কামানোর মাধ্যমে পরিণত হবে।

পুঁজিবাদীরা বলে মানুষ যে শ্রম ব্যয় করে তার ফলাফল হিসেবে উপযোগ পাওয়া যায়। সুতরাং পুরষ্কার যদি কাজের অনুরূপ না হয় তাহলে নিঃসন্দেহে উৎপাদন নিম্নমুখী হবে এবং তারা এটি থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সমাজের সদস্যদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের আদর্শিক পদ্ধতি হল তাই যা সর্বোচ্চ পরিমাণের উৎপাদনকে সুনিশ্চিত করে। এ পদ্ধতি পুরোপুরি ভুল। কেননা বাস্তবে যেসব সম্পদ স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন সেগুলোই পণ্যের মধ্যে থাকা উপযোগের ভিত্তি। এবং এসব সম্পদের উপযোগিতা বৃদ্ধির জন্য ব্যয়কৃত খরচ অথবা নতুন একটি উপযোগের সুত্রপাত করতে এর সাথে যোগকৃত শ্রম একটি বিশেষ উপযোগের যোগান দেয়। সুতরাং উপযোগকে কেবলমাত্র শ্রমের ফলাফল হিসেবে বিবেচনা করা পুরোপুরি ভুল। কেননা এটি কাঁচামাল ও অন্যান্য ব্যয়কে উপেক্ষা করে। কিছুক্ষেত্রে এ খরচ কাঁচামালের জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ, কোনভাবেই শ্রমের জন্য নয়। সুতরাং উপযোগ মানুষের শ্রমের ফলাফল হিসেবে আসতে পারে অথবা কাঁচামালের জন্যও আসতে পারে অথবা উভয়ের ফলাফল হিসেবে আসতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র মানুষের শ্রমের ফলাফল হিসেবে নয়।

কেবলমাত্র কাজের পুরষ্কার হ্রাস পেলেই উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায় না, বরং দেশ থেকে সম্পদ ক্রমাগত উজাড় হতে থাকলে, যুদ্ধ বা অন্য কোন কারণে উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বৃটেন ও ফ্রান্সের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণ কাজের পুরষ্কার কমে যাওয়ায় নয়, বরং ঐশ্বর্যপূর্ণ উপনিবেশগুলোর উপর তাদের প্রভাব সংকুচিত হওয়ায় এবং যুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণের কারণে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণ কাজের পুরষ্কার কমে যাওয়ায় নয়, বরং জার্মানীর সাথে তাদের যুদ্ধের কারণে। ইসলামী বিশ্বে আজকে উৎপাদনের যে হ্রাস ঘটেছে সেটিও কাজের পুরষ্কার কমে যাওয়ায় নয় বরং বুদ্ধিবৃত্তিক অধঃপতনের কারণে যাতে গোটা উম্মাহ্ নিপতিত। সুতরাং কাজের পুরষ্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততাই উৎপাদন হ্রাসের একমাত্র কারণ নয় এবং এই ভিত্তিতে চিন্তা করাও ভুল যে, বন্টনের আদর্শিক পদ্ধতি হল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। উৎপাদনের সর্বোচ্চ

...২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

“তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেরূপ তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর যারা কুফরী করবে তারাই আসলে ফাসেক।” [সূরা আন-নূর : ৫৫]

“তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তারপর আল্লাহ্ তার সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে নবুয়্যতের আদলে খিলাফত। তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, অতঃপর তিনি তারও সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর আসবে যন্ত্রণাদায়ক বংশের শাসন, তা থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। এক সময় আল্লাহ্’র ইচ্ছায় এরও অবসান ঘটবে। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে জুলুমের শাসন এবং তা তোমাদের উপর থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। তারপর তিনি তা অপসারণ করবেন। তারপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত – নবুয়্যতের আদলে।” *(মুসনাদে আহমদ, খন্ড ৪, হাদীস নং-১৮৫৯৬)*